বিজ্ঞানের
জাদু

# বিজ্ঞানের জাদু

শ্রীমনীন্দ্রনাথ দাস

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

## উৎসর্গ

শ্রীমতী কণিকা দাস

সুচরিতাসু

হৈমবতী
নরেন্দ্রপুর

শ্রীমান্ মণীন্দ্রনাথ দাস বিজ্ঞানের একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র। নিজে যা পেলেন, সবাইকে তার ভাগ দেবার গভীর আগ্রহ তাঁর আছে। লেখার ধরনটিও সহজ এবং মনোরঞ্জন। তাঁর এই বইখানা বাংলা দেশে বৈজ্ঞানিক বিষয় কৌতূহল জাগাবার সহায়ক হবে বলে আশা করি।

অনির্বাণ

# ভূমিকা

এই বইখানিতে বিভিন্নপ্রকার বৈজ্ঞানিক আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তাকর্ষক ক্রীড়াকৌতুকের বিবরণ সংক্ষেপে সঙ্কলন করা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা যাতে ঘরে বসে সহজেই এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একাধারে জ্ঞান ও আনন্দলাভ করতে পারে, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে এই পুস্তক রচিত। এই সকল রচনার মধ্যে কতকগুলি লেখা শিশুসাথী, শুকতারা, সন্দেশ ও মৌচাক পত্রিকায় ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। 'অঙ্কের জাদু' ও 'জাদুবর্গ' যথাক্রমে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত হয়, কিন্তু এই রচনা দুটি ছোটদেরও ভাল লাগতে পারে মনে করে আবার এই পুস্তকের অন্তর্গত করা হল।

ছোটরা যদি এই বই থেকে একটাও পরীক্ষা করে তৃপ্তি ও প্রেরণা পায়, তা' হলেই লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এই প্রসঙ্গে আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগত অধ্যাপক ক্ষেত্রপাল দাস মহাশয়ের ( ১৮৮৭-১৯৫৫ খ্রীঃ ) কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে, বাল্যকালে তিনিই আমায় Cargill Knott-প্রণীত 'Scientific Amusements বইখানি উপহার দিয়ে এবং Tissandier-এর লেখা 'Popular Scientific Recreations' গ্রন্থটি পড়তে দিয়ে সর্বপ্রথম এই দিকে আমার আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন।

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত 'বেদমীমাংসা' গ্রন্থের লেখক পূজনীয় স্বামীজী অনির্বাণ এই বইয়ের উদ্দেশে তাঁর আশীর্বাণী জানিয়ে আমায় বিশেষ উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করেছেন, এজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। সবশেষে শ্রদ্ধা জানাই সেই সব ইউরোপীয় ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের যাঁদের বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

'সাধনালয়'
পুরুলিয়া রোড,
রাঁচি,
১৯৭৩

মণীন্দ্রনাথ দাস

## রসায়নের জাদু

সঞ্জীবনী সুধা ও পরশ পাথরের অনুসন্ধানের ফলে রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। সেজন্য রসায়নশাস্ত্রের শৈশবকালে যাদুবিদ্যার প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে বলেছেন—অথর্ববেদের চর্চা হতেই ভারতে তথাকথিত আলকিমির (Alchemy) জন্ম হয়েছে। অথর্ববেদ প্রধানত ইন্দ্রজাল, যাদুবিদ্যা নিয়েই অধিক চর্চা করেছে। তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় এক ইন্দ্রজাল, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্রগুলি প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক জ্ঞানের আকর। প্রাচীনকালে, মধ্যযুগে এবং আধুনিককালেও যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের সময় রসায়নের সাহায্য ভালরকম নেওয়া হয়েছে। রসায়নের দ্বারা যে সব সুন্দর ম্যাজিক সহজে করা চলে এবার তার বিষয় আলোচনা করে দেখা যাক।

### আশ্চর্য আধার

বেগুনী বাঁধাকপি পাতা আধ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করে সেই রক্তাভ নীলবর্ণের জল একটি কাচের পাত্রে ঢেলে রাখো। এবার তিনটি কাচের গেলাস সংগ্রহ করে আনো। প্রথম গেলাস খালি রাখো, দ্বিতীয়টিতে এক ফোঁটা তরল অ্যামোনিয়া (Liquor ammonia) আর তৃতীয় গেলাসে এক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড দাও। এখন ঐ বেগুনী বাঁধাকপি-সিদ্ধ জল প্রথম গেলাসে পড়লে সেইরকমই থাকবে, দ্বিতীয় গেলাসে ঢাললে অ্যামোনিয়ার উপস্থিতির জন্য সুন্দর সবুজ বর্ণের হবে, আর তৃতীয় গেলাসে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকার জন্য উজ্জল লালরঙের হয়ে যাবে। রক্তাভ নীল বাঁধাকপির পরিবর্তে ঐ রঙের অন্য কোনো উদ্ভিজ্জ বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে।

### ধূম সঞ্চালন

প্রথমে একটি কাচের গেলাসের ভেতর কয়েক ফোঁটা তীব্র তরল অ্যামোনিয়া লাগিয়ে দাও এবং আর একটি প্লেটের গায়ে তেজস্কর

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মাখিয়ে নাও। এবার তুমি একটু দূরে থেকে নিজের হাতে ছোট্ট একটি ধূপকাঠি নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দাও আর এই ধোঁয়া গেলাসের ভেতর অলৌকিক উপায়ে প্রবেশ করবে—এই কথা সকলের সামনে ঘোষণা করে গেলাসের মুখে প্লেট চাপা দাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত সকলেই দেখবেন, ঐ গেলাসের মধ্যে রহস্যজনকভাবে ধোঁয়ার আগমন ঘটেছে। আসল কথা, গেলাসের ভেতর অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়ার ফলে ঠিক ভিজে খড়ের ধোঁয়ার মতো ঘন নীলাভ ধূসর অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বাষ্পাকারে উৎপন্ন হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যেখানেই ধূম সেখানেই অগ্নি—প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে পরাস্ত।

## রক্তাক্ত হস্ত

সোডিয়াম স্যালিসিলেট জলে গোলবার পর কোনো মসলিন কাপড় তাতে ভাল করে ভিজিয়ে সম্পূর্ণ শুষ্ক করে নাও। তারপর একে একটি শক্ত কার্ডবোর্ডের উপর স্থাপন কর। এখন ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট জলে দিয়ে আর এক রকম দ্রব (Solution) প্রস্তুত কর, এটা দেখতে অনেকটা জলের মতই বর্ণহীন হয়। তুমি কেবল তথাকথিত এই 'নির্মল' জলে হাত ধুয়ে পূর্বোক্ত পাতলা কাপড়ের উপর জোরে চেপে ধরবে, তা হলে তৎক্ষণাৎ তাতে গাঢ় লালরঙের হাতের ছাপ পড়ে যাবে।

## বিলীয়মান রঙ (Vanishing Colour)

ফেনপথালিন জলে গুলে নিয়ে ওতে লিকার অ্যামোনিয়াম ফোর্ট বা চুনের জল যোগ কর, তা' হলেই এই আশ্চর্য রঙ প্রস্তুত হয়ে যাবে। এই রঙ কোনো লোকের কাপড়ে দিবামাত্র সেটা গোলাপীবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু ঐ বস্ত্র শুকিয়ে গেলেই আবার আগেকার মতো সাদা হয়ে যায়। তোমরা দোলের দিন এই রঙ ব্যবহার করে দেখতে পার।

## জল স্তম্ভন

লাইকোপোডিয়াম একরকম শেওলার রেণু। এই সূক্ষ্ম রেণু সমস্ত হাতে ভালভাবে লাগিয়ে নিয়ে জলের মধ্যে স্থাপন করলেও আর্দ্র হয় না। সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর প্রতুলচন্দ্র সরকার ( পি. সি. সরকার ) নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন যে, জিঙ্ক স্টিয়ারেট প্যাউডার হাতে লাগিয়ে নিয়ে জলে ডোবালেও ভেজে না। এ ছাড়া ঘিয়ে ভাজা বালিও জলে নিমজ্জিত করলে শুষ্ক থাকে।

## অন্ধকারে আলোক বিকিরণ

ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড, স্ট্রনসিয়াম সালফাইড, জিঙ্ক সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের আলোক-শোষণের শক্তি আছে। এই সকল বস্তু কোনো উজ্জ্বল আলোর সামনে অল্পকাল রেখে অন্ধকারে আনলে আলোক বিকিরণ করে। একটি মাটির ভাঁড়ে সমুদ্রের ঝিনুকের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ মিশিয়ে ভাঁড়ের মুখ বন্ধ করে কয়লার উনানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট প্রচণ্ড উত্তাপ দিলে আলোক বিকিরণকারী ক্যালসিয়াম সালফাইড তৈরি হয়।

## বিনা দেশলাইয়ে আগুন জ্বালানো

একটুখানি তূলার মধ্যে দু ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে তার উপর কিছু পোটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট ছড়িয়ে দাও। তারপর ঐ তূলা দুই আঙুলে জোরে চেপে ধরেই তৎক্ষণাৎ মাটিতে ফেলে দাও, দেখবে মুহূর্তের মধ্যে ওতে আগুন ধরে উঠেছে।

## জলে আগুন জ্বালা

দুই গ্রেন পরিমাণ ধাতব পোটাসিয়াম নিয়ে যদি এক গামলা জলে নিক্ষেপ করা যায় তা'হলে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে উঠবে। এ ছাড়া জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ফসফরাস রেখে যদি তার কাছে একটি সরু

নলের মধ্য দিয়ে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়, তাহলে জলের নীচে বড় সুন্দর অগ্নিক্রীড়া দেখা যায়।

## রঙীন আগুন

এই প্রসঙ্গে আতস বাজির কথা উল্লেখযোগ্য। বাজিবিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রাচ্য ভূখণ্ডে, এখান থেকে এই বিদ্যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আসে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতেই এই বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি হয়। আতস বাজির প্রধান উপকরণ কাঠকয়লা ও গন্ধকচূর্ণ, এই দুই বস্তু জ্বলবার জন্য অক্সিজেনবহুল পোটাসিয়াম ক্লোরেট বা পোটাসিয়াম নাইট্রেট যোগ করা হয়। আলো রঙীন করবার উদ্দেশ্যে বিবিধ ধাতব লবণ দেওয়া হয়ে থাকে, যেমন স্ট্রনসিয়াম থাকলে লাল আলো আর তামা ও বেরিয়াম দিলে যথাক্রমে নীল ও সবুজ রঙ হয়। হলদে আলো করতে হলে সোডিয়ামের উপস্থিতি প্রয়োজন, আর পোটাসিয়ামের অস্তিত্ব থাকলে বেগুনী রঙ হয়। ক্যালসিয়ামের সংযোগে কমলা রঙের আলো হয়। ম্যাগ্‌নেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহচূর্ণ উজ্জ্বল আলোক ও সুন্দর স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন করে। নীচে সংক্ষেপে বাজির কয়েকরকম ভাগ দেওয়া হল। লাল আলো স্ট্রনসিয়াম নাইট্রেট এক ভাগ ও গালা পাঁচ ভাগ। সবুজ আলো: বেরিয়াম নাইট্রেট এক ভাগ ও গালা পাঁচ ভাগ।

ফুলঝুরি: গন্ধক এক ভাগ, সোরা আট ভাগ, কাঠকয়লা একভাগ, লৌহচূর্ণ দুভাগ। প্রত্যেক পদার্থ পৃথক্ ভাবে চূর্ণ করবার পর সাবধানে একত্র করে কাগজের সরু নলে ভরতে হবে।

## অদহনীয় বস্ত্র

ফটকিরির জলে কোনো কাপড় বা কাগজ বার বার ভিজিয়ে আবার শুকিয়ে নিলে সেটা আংশিকভাবে অদাহ্য হয়, এই প্রকারে তৈরি কাগজ বা কাপড়ে আগুন দিলেও সহজে পুড়তে চায় না। আজকাল অবশ্য অ্যাসবেসটস তন্তু দিয়ে এমন বস্ত্র তৈরি করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে অগ্নিনিরোধক।

## উত্তাপহীন অগ্নিশিখা

ফসফরাসকে আর্দ্র বাতাসের সংস্পর্শে আনলে আস্তে আস্তে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এই রাসায়নিক সংযোগের সময় অন্ধকারে নীলাভ আলো দেখা যায়। সরু নলযুক্ত ফ্লাস্কে ফসফরাস ও জল দিয়ে উত্তপ্ত করলে, ঐ নলের মুখে অন্ধকারে তাপহীন একপ্রকার সবুজাভ আলোকশিখা দেখা যায়। এই অগ্নিশিখা এতই ঠাণ্ডা যে, এতে কাগজ ধরলে পুড়বে না, দেশলাইয়ের কাঠি দিলে জ্বলবে না। চটপটি নামক বাজি জলে গুললে সহজেই ফসফরাস পাওয়া যেতে পারে।

কখনও কখনও ভিজা জায়গায় অন্ধকারে একরকম আলোকপুঞ্জকে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হতে দেখা যায়, কুসংস্কারাপন্ন গ্রামবাসীরা একে ভূতের আলো মনে করে ভীষণ ভয় পায়। নিম্নলিখিত উপায়ে কৃত্রিম আলেয়া উৎপাদন করা যেতে পারে। কোনো মাঠে একটি ছোট গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে অল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম ফসফাইড রেখে দেবে, তারপর বালি মেশানো মাটি ছড়িয়ে আলগাভাবে সেই গর্তের মুখ বন্ধ করবে। এবার ওর উপর জল ছিটিয়ে দিলেই অন্ধকার রাত্রিতে আলেয়ার মতো আলো দেখা যাবে।

## অদৃশ্য অক্ষর

এখানে প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক এডগার এলান পো-র লেখা 'স্বর্ণকীট' ( Gold Bug ) নামক গল্পটি মনে পড়ে যায়। এই গল্পের নায়ক লিগ্রাণ্ড সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে একটি পার্চমেন্ট কাগজ কুড়িয়ে পান। ঘটনাক্রমে এই কাগজে অগ্নিতাপ লাগায় একরকম সাঙ্কেতিক লিপি ফুটে ওঠে। এই লেখার পাঠোদ্ধার করে লিগ্রাণ্ড বিস্তর গুপ্তধন লাভ করেন।

ভাতের ফেন দিয়ে কোনো কিছু লিখলে ক্রমশ তা অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু ওর উপর আইওডিন প্রয়োগ করলে নীল রঙের লেখা প্রকাশ

পায়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের সময় এই প্রক্রিয়া কাজে আনা হয়েছিল।

দুধ অথবা লেবুর রস দিয়ে কাগজে কিছু লিখে শুকিয়ে নিলে ঐ লেখা অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু আগুনের সামনে কাগজখানি গরম করলে আবার অক্ষরগুলি বাদামী বর্ণের হয়ে দেখা দেয়। আর এক রকম অদৃশ্য কালি আছে, এ জিনিসটা ভিনিগার ও সোরা মিশিয়ে প্রস্তুত করা যেতে পারে। গরম করলে এই কালির লেখা গোলাপী রঙের হয় আর ঠাণ্ডা করলে আবার মিলিয়ে যায়।

শ্বেতসার অথবা ময়দা জলে গুলে কয়েক ফোঁটা টিঞ্চার আইওডিন দিলে বেগুনী রঙের আইওডাইড অফ স্টার্চ তৈরি হয়। এই দ্রব দিয়ে কাগজে কোনো কথা লিখলে যখন ইচ্ছা তা' কাপড় দিয়ে পুঁছে ফেলা যায়। বস্ত্রাদিতে কোনোক্রমে আইওডিনের দাগ লাগলে সেখানে দুধ লাগাতে হয়, তা'হলে তখনি উঠে যায়।

কোবাল্ট ক্লোরাইড জলে গুলে তাই দিয়ে কাগজে কোনো কিছু লিখলে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু তাপ প্রয়োগ করলে নীল রঙের লেখা প্রকাশ পায়। বিসমাথ নাইট্রেটের দ্রব দিয়ে কাগজে লিখলে সেই লেখা সাধারণ অবস্থায় অদৃশ্য থাকে কিন্তু ভালো জলে ভেজালেই দৃষ্ট হয়।

## পুষ্পের বর্ণ পরিবর্তন

অ্যামোনিয়ার জলে লাল ও বেগুনী রঙের ফুল নিমজ্জিত করলে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের হয়ে যায় আর সাদা ফুল হলদে রঙের হয়। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে ইথার মিশ্রিত করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়। যে ফুল অ্যামোনিয়ার প্রভাবে একবার হরিতবর্ণ ধারণ করেছে তাতে মৃদু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে আবার রক্তাভ হয়ে যায়। নিশাদল ও চুন একত্র করলে সহজেই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

## অদ্ভুত কালি

কোনো কালির দোয়াতে যদি সামান্য পরিমাণ সূক্ষ্ম রজনচূর্ণ কৌশলে নিক্ষেপ ক'রে ওর মধ্যে কোনো কাগজ ডোবান হয়, তা' হলে কিছুতেই কালি লাগে না, সেই কাগজ সম্পূর্ণ সাদা থাকে।

## গলা সীসা হাতে রাখা

এই বস্তু প্রকৃতপক্ষে সীসা নয়। একপ্রকার মিশ্র ধাতু, ইহার উপকরণ এই ঃ

| | |
|---|---|
| বিসমাথ | ৮ ভাগ |
| সীসা | ৪ ,, |
| রাঙ (Tin) | ২ ,, |
| পারা | ১ ,, |

এই মিশ্রণ সামান্য উত্তাপেই গলে যায়, সেজন্য অনায়াসে শুধু হাতের উপর রাখা চলে।

## আশ্চর্য লিপি

আমেরিকার প্রসিদ্ধ যাদুকর হাওয়ার্ড থার্সটন (১৮৬৯-১৯৩৬ খ্রীঃ) একটা খুব আশ্চর্য খেলা দেখাতেন। একটি সিদ্ধ ডিম খুব ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখাবার পর সকলের সামনে রাখা হ'ত। তারপর দর্শকদের মধ্যে একজন প্যাকের ভেতর থেকে একখানি তাস টেনে দেখে নিয়ে আবার পূর্বস্থানে রেখে দিতেন। এরপর ঐ ডিম ভাঙ্গা হলে নির্বাচিত তাসের নাম তার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে দেখা যেত। এর গুপ্ত কৌশল এই ঃ এক আউন্স ফটকিরি পাঁচ আউন্স ভিনিগারে দ্রব কর, তারপর তুলি দিয়ে একটি আস্ত ডিমের খোলার উপর কোনো কথা লিখে রাখো, শুকিয়ে গেলেই ঐ লেখার সকল চিহ্নই মিলিয়ে যাবে। অতঃপর ঐ ডিম নিয়ে দশ মিনিট কাল গরম জলে সিদ্ধ করতে হবে। এখন যদি ডিমের বহিরাবরণ অপসারিত করা যায়, তা'হলে পূর্বের লেখা সমস্ত অক্ষরই ডিমের গায়ে পরিষ্কারভাবে দেখা

যাবে। বলাবাহুল্য যে, যাদুকরের ইঙ্গিত তাস প্রতিবারই টানতে দর্শকরা বাধ্য হতেন।

## দুধকে জল করা

যাদুকরেরা যে দুগ্ধ ব্যবহার করেন প্রকৃতপক্ষে তা' দুধ নয়, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও সোডার জলীয় মিশ্রণ মাত্র। দুধের মতন দেখতে এই তরল পদার্থ যদি একটি কাচের গেলাসে ঢেলে তাতে যৎসামান্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ করা যায়, তা'হলে তৎক্ষণাৎ তা' পরিষ্কার হয়ে গিয়ে জলের মত স্বচ্ছ হবে।

## রঙের খেলা

এক কাপ জলে এক চামচ আইওডিন দিলে অনেকটা কফির মতো দেখতে হয়। কৌশলে এরমধ্যে এক দানা হাইপো নিক্ষেপ করে নাড়লেই ঐ জল সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহীন হয়ে যায়। চুনের জল ও হলুদ জল একসঙ্গে করলে কিরকম লাল রঙের হয়ে যায় তা' সকলেই জানে। একটি কাগজে জবা ফুল ঘষে নিলে নীল রঙের হয়ে যাবে, তখন ওর ওপর লেবুর রসের ছিটা দিলে সুন্দর গোলাপীবর্ণের ফুটকি দেখা দেবে।

## নিশ্বাস ফেলে আগুন জ্বালা

অনেকেরই এই আশ্চর্য প্রক্রিয়ার গোপন তত্ত্ব জানা নেই। সিকি আউন্স কার্বন-ডাই-সালফাইড নিয়ে তাতে মটরশুঁটি পরিমাণ ফসফরাস দেবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ ফসফরাস গলে যাবে। এই দ্রব এক চামচ নিয়ে একটি ব্লটিং কাগজের ওপর ঢালবে। তারপর এর ওপর জোরে জোরে ফুঁ দিতে থাকলেই কার্বন-ডাই-সালফাইড উবে গিয়ে কাগজের গায়ে ফসফরাসের একটা পাতলা স্তর পড়ে যাবে এবং সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বলে উঠবে। পূর্বকালে শত্রুপক্ষের লোকেরা ঘরের জানালা কিংবা চিমনি দিয়ে এই সহজদাহ্য তরল বস্তু

কাচের শিশি করে ছুঁড়ে ফেলে দিত। তারপর ঐ শিশি ভেঙ্গে গিয়ে যখন ঐ তরল পদার্থ পড়তো তখন চারিদিকে আগুন ধরে যেত।

রসায়নের রসিকতা বিচিত্র। অবসরকালে সহজসাধ্য রাসায়নিক পরীক্ষাগুলি করে দেখতে পারলে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, আর সেই সঙ্গে প্রকৃতির অনেক রহস্য জানা সম্ভব হয়।

## চিনি ও আগুন

সাধারণ অবস্থায় চিনিতে আগুন দিলেও কিছুতেই পুড়তে চায় না, কিন্তু ওর সঙ্গে একটু ছাই মিশিয়ে নিলে সহজেই অগ্নিদাহ্য হয়। এখানে ছাই দহনের সহায়ক (catalyst)-রূপে কাজ করে।

যখন কোনো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় অন্য কোনো বস্তু সাহায্য করে কিন্তু নিজে পরিবর্তিত হয় না, তখন তাকে সহায়ক বা সজ্বটক বলা হয়। আমাদের মুখে ও পেটের মধ্যে যে সমস্ত পাচক রস আছে তাদের কাজও অনেকটা এই রকমেরই। উদ্ভিজ্জ তৈল ও হাইড্রোজেন গ্যাস একযোগে নিকেলের সংস্পর্শে এলে তবেই একে অন্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে জমাট ঘিয়ে পরিণত হয়। এক্ষেত্রেও নিকেল নিজে বদলায় না, কিন্তু রাসায়নিক সংযোগে সাহায্য করে মাত্র।

প্ল্যাটিনাম খুব মূল্যবান্ ধাতু হলেও সজ্ঘটকরূপে এর ব্যবহার আছে। একটি টেস্ট টিউব কিংবা ছোট কাচের গেলাসে খানিকটা মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে যদি তার মধ্যে প্রায় ওপর দিকে ফাঁকা জায়গায় একটি সূক্ষ্ম সরু প্ল্যাটিনামের তার রাখা যায় তাহলে কিছুক্ষণ পরে ঐ তারটি গরম হ'তে শুরু হবে এবং ক্রমশ তপ্ত হয়ে রক্তবর্ণ ধারণ করবে। এমনকি কখনও কখনও এইভাবে তাপজননের ফলে স্পিরিটে আগুন ধরে যেতে পারে। এখানেও স্পিরিটের বাষ্প ও বায়ুর অক্সিজেন প্ল্যাটিনামের প্রভাবে সম্মিলিত হবার ফলে তাপোদ্ভব হয়ে থাকে। একে স্বতঃপ্রজ্জ্বলনের একটা উদাহরণ বলা যেতে পারে।

## যে জিনিস ওপরে ওঠে

সচরাচর আমরা সমস্ত প্রাণহীন পদার্থকে ওপর থেকে নীচের দিকেই গড়িয়ে আসতে দেখি, কিন্তু যদি কোনো জিনিস আপনা থেকেই
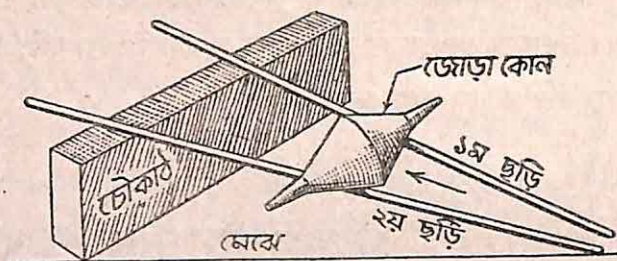
ওপরে উঠতে থাকে তাহলে বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হবে। এখন যে মজার পরীক্ষার কথা বলব তাতে দেখা যাবে নির্দিষ্ট বস্তু নিজে হতেই নীচে থেকে ক্রমশ ওপরে উঠছে।

প্রথমে শক্ত কাগজ কিংবা নরম কার্ডবোর্ড দিয়ে দুটি শঙ্কু বা কোন (cone) তৈরি করে নিয়ে একসঙ্গে জুড়ে নিতে হবে, যেমন ছবিতে আছে। দুটি টিনের ফানেল রাঙঝাল দিয়ে জুড়ে নিলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

তারপর ঘরের মেঝেতে দুটি ছড়ি কোণাকুণি করে ইংরেজী V অক্ষরের মতো এমনভাবে রাখতে হবে যাতে করে খোলা দিক্ সামান্য উঁচু হয়ে চৌকাঠের ওপর থাকে আর জোড়া দিক্ মাটি ছুঁয়ে অবস্থান করে। এই ছড়ি দুটিই হবে আমাদের লাইন। এদের কোণাকুণি দূরত্ব কিরকম হবে সেটা কয়েকবার পরীক্ষা করে ঠিক করে নিতে হবে।

এবার ঐ জোড়া কোন (cone) নীচের দিকে দুটি ছড়ির মাঝখানে বসিয়ে দিলেই আপনা হতেই গড়গড়িয়ে ওপরে উঠতে থাকবে। অবশ্য একটু লক্ষ্য করলে আর চিন্তা করে দেখলে বোঝা যাবে, বাস্তবিক ভারকেন্দ্র ওপরে না গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নীচের দিকেই যাচ্ছে।

একে একরকম চোখের ধাঁধা বা optical illusion বলা চলে। চৌকাঠের উচ্চতা এবং ছড়ি দুটির কোণাকুণি দূরত্ব কম-বেশি কিরকম

হবে, সেটা কয়েকবার পরীক্ষা করে স্থির করে নিতে হবে, তাহলে সহজেই জোড়া কোণ ওপরে উঠবে। এটি বহুপরীক্ষিত।

## উর্ধ্বগামী বাক্স

কোনো কোনো দেশে কুয়া থেকে জল তোলবার জন্য কিংবা কোনো ওজন ওপরে ওঠাবার উদ্দেশ্যে এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হ'ত। এজন্য একে ভার-উত্তোলক যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই যন্ত্রে ২টি চাকা পাশাপাশি জোড়া থাকে। একটি চাকার ব্যাস বড় আর অন্যটি ছোট হয়। ছোট-বড় দুটি রিল একসঙ্গে তার কিংবা পিন দিয়ে আটকে নিলেও চলে। একটি ছোট বিস্কুটের টিনের

ভেতর মোটা তার কিংবা কাঠি লাগিয়ে রিল দুটি বসাতে হবে। যন্ত্রবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বড় ব্যাসওলা চাকায় সুতা জড়িয়ে টান দিলে তার জোর সুতা জড়ানো ছোট চাকার চেয়ে বেশি হবে। সেইজন্য টিনের বাক্স আস্তে আস্তে ওপরে উঠবে। এই বাক্সের ওপরে ও নীচে দুটি ফুটা থাকে, সুতার দুই প্রান্ত এই দুই ছিদ্র দিয়ে বার হয়ে আসে। বাক্সের মধ্যে সুতা জড়ানো রিল দুটি একটি ছোট কপিকল (pulley) ছাড়া আর কিছুই নয়।
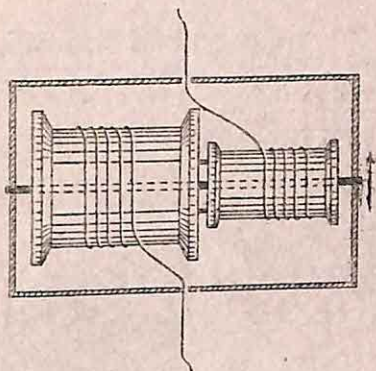
রবার বা টিনের বল কিংবা আখরোটের খোলার মধ্যে ছোট করে সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারলে সমস্ত জিনিসটা আরও সুন্দর হয়। এক টুকরা পেন্সিলের সীস বার করে নিয়ে এক পাশে পুরু করে

কাগজ জড়িয়ে নিয়ে গঁদ দিয়ে জুড়ে নিতে হবে আর অন্য অর্ধেক পাখা খালি থাকবে। মাঝখানে আর দুই প্রান্তে কার্ডবোর্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকতি লাগাতে হবে, তাহলে সহজেই ছোট-বড় দুই রকম চাকা একসঙ্গে তৈরি হয়ে যাবে।

জিনিসটা ঠিকমতো তৈরি করে বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে পারলে তারা যে অবাক হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। বাজারে যে সুতো বাঁধা টিনের বাঁদর বিক্রি হয় তার মধ্যে এই রকম ব্যবস্থা ই থাকে।

## ভারকেন্দ্রের কথা

ছবিতে যেরকমটি আছে অবিকল সেইরকম একটি প্রজাপতি বা ফড়িং সাদা কার্ডবোর্ডের উপর এঁকে নিয়ে কাঁচি দিয়ে সমান করে কেটে নিতে হবে। তারপর তার ডানার নীচে দুই প্রান্তে একটি দুই
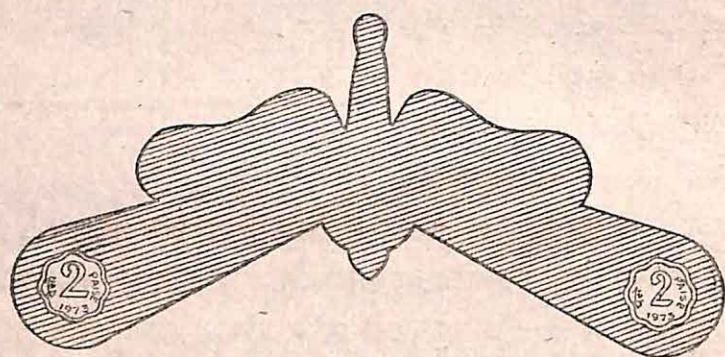
নয়া পয়সার মুদ্রা আঠা দিয়ে আটকে দিতে হবে। দেখতে সুন্দর করবার জন্য এই প্রজাপতির উপরটা নীল কাগজ দিয়ে ঢেকে দেবে কিংবা রঙ দিয়ে নীলাভ করে নেবে। তারপর প্রজাপতির ঠিক মুখের নীচে আঙুলের ডগা দিয়ে ধরলে সেটি তখন স্থির হয়ে বসে থাকবে, মোটেই পড়বে না বা হেলবে না। কারণ, এর ভারকেন্দ্র (centre of gravity) যে তখন সেখানে রয়েছে।

## হুঁকোর মজা

পথের ধারে এক এক সময় বেদে জাতীয় বাজিকরেরা সামান্য একটা হুঁকো নিয়ে বড় সুন্দর খেলা দেখায়। হুঁকোতে জল ভরে উল্টোমুখ করে একটি ছোট্ট পাত্রের উপর হেলান দিয়ে রাখা হয়, এই পাত্রে ছোট্ট এক ছেঁদা থাকে। হুঁকোর খোলে যে ফুটা থাকে সেখান
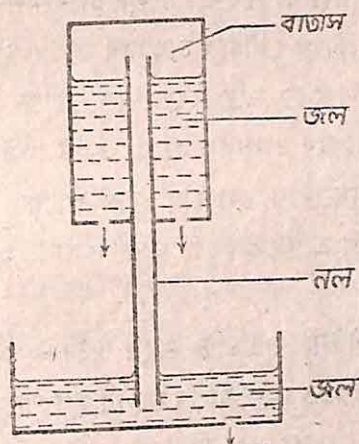
দিয়ে জোরে জলপড়ার ফলে ছোট পাত্রটি যেই ভরে যায় অমনি জলঝরা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু নীচেকার পাত্রের সঞ্চিত জল সরু ছেঁদা দিয়ে যখন সমস্ত বেরিয়ে যায় তখন আবার হুঁকো থেকে ঝরণার মত জল পড়তে থাকে। বাজিকর জলস্রোতের গতি নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং ঠিক সময়মতো জল পড়তে ও বন্ধ হ'তে আজ্ঞা দেয়, লোকে মনে করে যে, জলস্রোত যেন তার আজ্ঞাধীন।

আসল কথা হুঁকো থেকে জল ঝরে যেই ক্ষুদ্র পাত্রটি ভরে যায়, তখন হুঁকোর মুখও সেই জলে ডুবে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে জল পড়া বন্ধ হয়, তার কারণ তখন আর হুঁকোর খোলের মধ্যে বাতাস যেতে পারে না। কিন্তু পাত্রের ছোট ফুটা দিয়ে সমস্ত জল বেরিয়ে গেলেই আবার হুঁকোর মুখ দিয়ে ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে আর সেই সঙ্গে পুনরায় জল পড়া আরম্ভ হয়।

এই রকম অবিরাম ফোয়ারা বাড়িতে বসেও করা যায়। একটা লম্বা ধরনের ঢাকনা শুদ্ধ টিনের কৌটা নিতে হবে, আর চাই একটা লম্বা নল—যেটা কাচের, টিনের, বাঁশের কিংবা কাগজের তৈরি হলেও চলবে। কৌটায় ঢাকনা লাগিয়ে তার ঠিক মাঝখানে ফুটা করে ভিতরদিকে প্রায় সমস্ত নলটাই প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে, কেবল উপরদিকে খানিকটা খালি থাকবে। নলের চারিপাশ মোম দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। কৌটা ও কৌটার ঢাকনার মাঝখানে যে ফাঁক আছে সেটাও মোম দিয়ে ভাল করে ভরে দিতে হবে, যাতে সেখান দিয়েও বাতাস না যায়। সবশেষে ঢাকনার গায়ে একটু বড় অতিরিক্ত দুটি ফুটা করতে হবে, সেখান দিয়ে জল বার হতে পারে। এরপর ছোট একটা অগভীর টিনের পাত্র নিতে হবে, যার তলায় সরু মতো এক ছেঁদা থাকবে।

এখন টিনের কৌটায় জলভর্তি করে ছেঁদা-করা ছোট পাত্রে এমনভাবে উপুড় করে ধরতে হবে, যাতে নলের মুখ পাত্রের তলা থেকে সামান্য উপরে থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, কৌটা থেকে যতজোরে জল পড়ে তার চেয়ে যেন আস্তে আস্তে নীচেকার পাত্রের তলা থেকে বার হয়ে যায়।

## আজ্ঞাবহ শিশি

এবার একটি বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলব। এই মজার খেলার উদ্ভাবক প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ দেকার্টে (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রীঃ)।

প্রথমে হরলিকসের শিশির মতো একটি চওড়া মুখের কাচের শিশি সংগ্রহ করে তার তিন-চতুর্থাংশ জলপূর্ণ করতে হবে। তারপর চাই সাইকেল বা মোটরগাড়ির চাকার টিউব থেকে চৌকা করে কাটা এক টুকরা রবার আর হোমিওপ্যাথির শিশির মতো ছোট আর একটি শিশি। এই ছোট্ট শিশি প্রায় অর্ধেকটা জলে ভরে বড় শিশির মধ্যে ছেড়ে

দিতে হবে। এরপর বড় শিশির মুখটা রবার দিয়ে এমনভাবে শক্ত করে সুতা দিয়ে বাঁধতে হবে যাতে রবারের আচ্ছাদন টান হয়ে আটকে থাকে, আর কোনো বাতাস ভেতরে যেতে বা বাইরে আসতে না পারে। এখন যদি ঐ রবারের আবরণের ওপর আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দেওয়া হয়, তা হলে দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শিশিটি নীচে নেমে যাচ্ছে, আবার আঙ্গুল সরিয়ে নিলেই সেটি তৎক্ষণাৎ ওপরে উঠে এসে ভাসতে থাকবে।
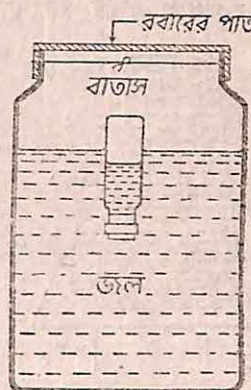
শিশির ওঠা-নামা সম্পূর্ণ ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। অন্য কেউ এই আশ্চর্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলে প্রথমটা অবাক হয়ে যাবে। ছোট শিশির সঙ্গে যদি টিনের রঙীন মাছ বা মানুষ ডুবুরী সংলগ্ন করে দেওয়া হয়, তাহলে জিনিসটা আরও সুন্দর হবে দেখতে।

কিন্তু কেন এ রকম হয়? এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি? রবারের ওপর আঙ্গুল দেবার সঙ্গে বড় শিশির ভেতরকার বাতাসে চাপ পড়ে এবং এই চাপ জলের মধ্য দিয়ে গিয়ে ছোট শিশির ওপরকার বাতাস সঙ্কুচিত করে আর তার ফলে ছোট শিশিতে আরও একটু বেশি জল প্রবেশ করে এবং এর জন্য সেটা ভারী হয়ে গিয়ে নীচে নেমে যায়।

মাছেদের শরীরে যে বায়ুপূর্ণ পটকা থাকে তার কার্যকারিতাও অনেকটা এই রকমই। যখন জলের নীচে যাবার দরকার হয় তখন মাছেরা এই বায়ুস্থলী সঙ্কুচিত করে নেয় আর তার ফলে সমস্ত দেহটা অপেক্ষাকৃত ভারী হয়ে যায়। ওপরে ওঠার প্রয়োজন হলে তারা এই বায়ুপূর্ণ থলি প্রসারিত করে নেয় আর তখনি সমস্ত শরীরটা পারিপার্শ্বিক জলের তুলনায় অনেকটা হাল্কা হয়ে যাওয়ার দরুন ওপরে ভেসে ওঠে।

## জলভরা গেলাস
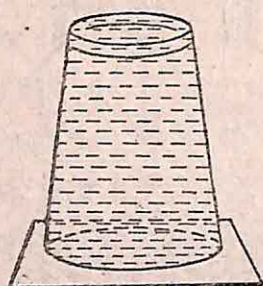
প্রথমে একটি কাচের গেলাস নিয়ে তাতে কানায় কানায় জল

ভর্তি করবে। তারপর তার ওপর একটি কার্ড রেখে বাঁ হাত দিয়ে ঐ গেলাসের মুখ চাপা দেবে। এবার করবে কি, ডান হাত দিয়ে গেলাসটি ধীরে তাড়াতাড়ি উল্টে দেবে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বাঁ হাত সরিয়ে নিলেও তখন গেলাসের জল এক ফোঁটাও পড়বে না। বাতাসের চাপের জন্যই এটা হয়ে থাকে।

## দেশলাই কাঠির মিষ্টপ্রিয়তা

শুধু তোমরা নও, দেশলাইয়ের কাঠিরও মিষ্টির উপর খুব টান। সত্যি-মিথ্যা পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবে।

প্রথমে এক গামলা জল নিয়ে তার উপর কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠি ঠিক তারার মতো করে সাজিয়ে দিতে হবে। এবার এক টুকরো
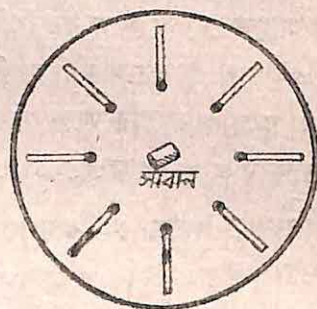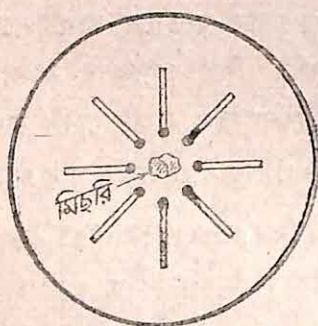
সরু সাবান এনে তারার মাঝখানে ডোবালেই দেখবে তৎক্ষণাৎ কাঠিগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হবে যেন ক্ষারদ্রব্যের প্রতি এদের ভীষণ বিরাগ। এখন আবার যদি তারার কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড মিছরি ডোবানো হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাঠিগুলো চারিপাশ থেকে এসে চুম্বকের মতো মিছরির গায়ে গিয়ে লেগে যাবে।

আসল কথা সাবানজলের চেয়ে শুধু জলের ওপর টান (surface tension) বেশি, সেজন্য সাবান ডোবালে কাঠিগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর সাধারণ জলের চেয়ে মিছরির জলের টান বেশি, সেজন্য মিছরি ডোবালে কাঠিগুলো মাঝখানে এসে জড়ো হয়।

## তাপের খেলা

উত্তাপের সাহায্যে অনেক রকম মজার মজার খেলা দেখানো যায়। যেমন কাগজের ঠোঙায় জল গরম করা—একটি কাগজের ঠোঙা তৈরি করে তার মধ্যে জল দিয়ে কোনো জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা বা স্পিরিট ল্যাম্পের উপর কিছুক্ষণ ধরলেই সেই জল ফুটতে আরম্ভ করবে, কিন্তু কাগজে কিছুতেই আগুন লাগবে না, অগ্নির সমস্ত উত্তাপই জল শোষণ করে নেয়, কাগজে আগুন ধরবার আর অবকাশ পায় না। এইভাবে একটি পোস্টকার্ড মুড়ে তার মধ্যে রাঙ (tin) কিংবা সীসার (lead) পাত রেখে সাবধানে আগুনের উপর ধরলে এই সব ধাতু গলে যাবে কিন্তু কার্ডবোর্ড পুড়বে না।

একটি মোটা লোহার পেরেক কিংবা চাবির গায়ে যদি ফিতার মতো করে কাগজ জড়িয়ে নেওয়া হয় আর তারপর সেটা অগ্নিশিখার উপর ধরা যায়, তাহলে অনেকক্ষণ অবধি সেই কাগজে আগুন লাগে না। কাগজের বদলে যদি লোহার গায়ে তূলার সুতা ঐভাবে ধরা যায়, তাহলেও ঐ সুতা অদহনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু কাচের নলের উপর কাগজ বা সুতা জড়ালে এই পরীক্ষা সফল হয় না, কারণ কাচ তাপের অপরিচালক বস্তু।

কাঁসার গোল বাটির উপর টান করে কাপড় জড়িয়ে তার উপর জ্বলন্ত অঙ্গার স্থাপন করলে বেশ কিছুক্ষণ ঐ কাপড় অদাহ্য থাকে। আসল কথা, এইসব পরীক্ষার সময় ভিতরকার ধাতব বস্তুই সমস্ত তাপ হরণ করে নেয়, সেজন্য আর কাগজ বা কাপড়ে অগ্নিসংযোগ হবার সুযোগ হয় না।

তোমরা যারা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে হাতে-কলমে কাজ কর, তারা এই মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার—একটি সুতির রুমাল নিয়ে জ্বালানি গ্যাস-সরবরাহের ধাতব নলের উপর টান করে বেঁধে দাও, তারপর ঐ গ্যাস জ্বাললে তূলার রুমালের ওপর বেশ জ্বলতে থাকবে কিন্তু ঐ রুমালে মোটেই আগুন লাগবে না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অনেকেই জান্তব চৌম্বক শক্তির (animal magnetism) ওপর বিশেষ আস্থাবান্ হয়েছিলেন। সম্মোহনবিদ্যা (hypnotism) সম্পর্কিত পরীক্ষার সময় এই বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। এবিষয় তোমরাও একটা আশ্চর্য পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটি লম্বা চতুষ্কোণ কাগজ কেটে যোগ চিহ্নের মতো এইভাবে (+) ভাঁজ করে নেবে। তারপর টেবিলের ওপর একটি সুচ বা পিন খাড়া করে বসিয়ে তার ডগায় কাগজখানি সন্তর্পণে বসিয়ে দেবে, যাতে করে ভারসাম্য ঠিক থাকে। ঐ কাগজখানি রাখবার আগে ঘরের দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে, যেন বাতাস না আসে। এবার কাগজের কাছে প্রসারিত হাত আনলেই বিনা কারণে কাগজখানি আস্তে আস্তে ঘুরতে আরম্ভ করবে। এর কারণ রহস্যজনক কিছুই নয়, তোমার হাতের উত্তাপের ফলে যে সামান্য বায়ু-স্রোতের সৃষ্টি হয়, তার জন্যই হালকা কাগজের টুকরা নড়তে থাকে।

জৈব উত্তাপ বা দৈহিক তাপ বিকিরণের আর একটি খুব সূক্ষ্ম পরীক্ষা আছে। বাজার থেকে আনা জিনিসপত্র যে পাতলা সেলোফেন পেপারে মোড়া থাকে তার একখণ্ড সংগ্রহ করে আনো। এই রকম কাগজের ওপর মানুষের এক মূর্তি এঁকে কাঁচি দিয়ে সমান করে কেটে নাও। এখন ঐ ছবিটি প্রসারিত করতলে স্থাপন করলেই আপনা থেকেই নড়াচড়া করতে থাকবে। হাতের উত্তাপে কাগজখানি পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত ও সঙ্কুচিত হয় বলেই এরকম ঘটে। তবে গ্রীষ্মকালেই এই পরীক্ষা সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

সবশেষে বরফের সাহায্যে জল ফোটানোর এক অভিনব উদাহরণ দিয়ে এই ছোট্ট প্রবন্ধটি শেষ করব। প্রথমে একটি মজবুত কাচের

বোতল ও ছিপি চাই। ছিপিটা কর্কের বদলে রবারের হলেই ভালো হয়। একটি পাত্রে লবণ-জল দিয়ে উনানের ওপর স্থাপন কর। যখন এই জল ফুটতে আরম্ভ হবে, তখন তার মধ্যে আবার আংশিকভাবে জলপূর্ণ করে বোতলটিও বসিয়ে দেবে, কিন্তু তখন তাতে ছিপি লাগাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই যখন এই বোতলের জলও ফুটতে আরম্ভ করবে, তখন তাড়াতাড়ি তার মুখে সজোরে ছিপি লাগিয়ে সাবধানে কাপড়ে জড়িয়ে উনান থেকে তুলে নেবে। বাইরে বার করে খানিকক্ষণ রাখলেই বোতলটি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এবার বোতলটি উল্টো করে ধরে তার ওপর বরফ জল ঢাললেই দেখবে আবার ভিতরকার জল ফুটতে আরম্ভ করেছে।

কেন এরকম হয় বলতে পার? বোতলের ওপর ঠাণ্ডা জল পড়ার জন্য মধ্যেকার বাষ্প জমে জল হয়ে যায় আর সেইজন্য ফাঁকা হয়ে ভিতরের চাপ বেশি কমে যায়, এই কারণে পুনরায় জল ফুটতে থাকে।

তোমরা বোধ হয় জানো, সাগর-সমতল প্রদেশে জল ১০০° সেন্টিগ্রেড তাপে ফোটে। কিন্তু ঐ জলই ১৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলে ৮৫° সেন্টিগ্রেড তাপেই ফুটতে আরম্ভ করবে, কারণ তোমাদের জানা আছে, যত উঁচুতে ওঠা যায় ততই বাতাসের চাপ কমে যায়। তেমনি আবার মাটির নীচে গভীর খনির মধ্যে গিয়ে জল গরম করলে ১০০° সেন্টিগ্রেডেরও বেশি তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে হয়, কারণ এই সব জায়গায় বাতাসের চাপ বেশি।

## গেলাসের মধ্যে জল ওঠা

এই পরীক্ষার জন্য চাই একটি কাচের গেলাস ও একখানি ছোট থালা। প্রথমে এই থালাটি কানায় কানায় জলে পূর্ণ করে নিতে হবে। তারপর করবে কি, এক টুকরা কাগজ জ্বেলে এনে ঐ কাচের গেলাসের ভেতর তাড়াতাড়ি ফেলে দেবে। গেলাসের মধ্যে কাগজখানি পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গেলাসটির মুখ

উল্টে ধরে থালার ওপর রাখতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখবে থালা থেকে সজোরে জল উঠে গেলাস ভরে ফেলেছে। এট্য বেশ আশ্চর্য ব্যাপার। আসল কথা গেলাসের মধ্যে কাগজ পোড়ার জন্য
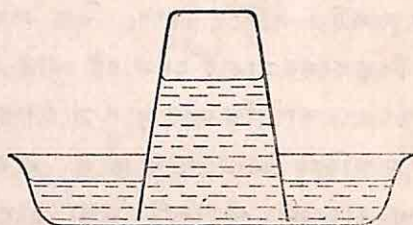
সেখানকার অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে যায়, আর উত্তপ্ত বায়ু বেরিয়ে গিয়ে সেই জায়গা বেশ খানিকটা ফাঁকা করে দেয়। সেজন্য প্রবল বেগে জল উঠে সেইস্থান পরিপূরণ করে। কাগজের বদলে গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জ্বাললে এই খেলাটা আরও সুন্দর হয়।

## ঘরের তৈরি বাষ্পীয় জাহাজ

তোমরা সবাই দেখেছ, জ্বলন্ত হাউই বাজি থেকে সবেগে ধোঁয়া ও আগুন বেরিয়ে জিনিসটাকে কতজোরে আকাশের দিকে ঠেলে দেয়। আজকাল এই প্রক্রিয়া জেট এরোপ্লেনে কাজে আনা হয়েছে। বাড়িতে চৌবাচ্চার মধ্যে একটি ছোট কাঠের বা কাগজের নৌকা এই পদ্ধতিতে চালানো যেতে পারে।

একটি ডিমের এক প্রান্তে ছোট্ট ছেঁদা করে সমস্ত কুসুম ও শ্বেতাংশ বার করে নিতে হবে। তারপর ডিমটা একটু গরম করে জলে
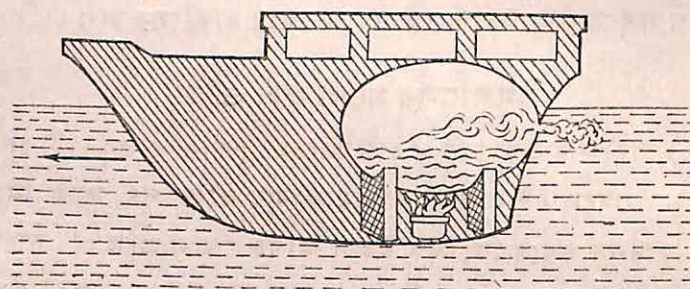
ডোবালেই সামান্য পরিমাণ জল ওর ভেতর ঢুকে যাবে, কিম্বা

ফোঁটা ফেলা ড্রপারের সাহায্যেও ওর মধ্যে একটু জল পুরে দেওয়া যেতে পারে। এটা হলো আমাদের বয়লার। ডিম না পেলে তার বদলে নস্যির ডিবের মতো লম্বা ছোট কৌটো নিয়ে তার মুখে ঢাকনা লাগিয়ে সমস্ত ফাঁক রাঙ-ঝাল দিয়ে বন্ধ করে তারপর ঢাকনার ঠিক কেন্দ্রস্থলে পূর্বের মতো ছোট্ট ছেঁদা করে জল ভরে নিলেও বেশ কাজ চলবে। সমস্ত জিনিসটা যদি সুকৌশলে একটি কাঠের বা কাগজের নৌকার ওপর লোহার তার দিয়ে আটকে দেওয়া হয়, তাহলে খুব সহজেই একটা ছোট্ট বাষ্পীয় জলযান প্রস্তুত হয়ে যায়।

এবার ওর তলায় একটি অঙ্গুলিস্ত্রাণে স্পিরিটে তূলা ভিজিয়ে যদি আগুন জ্বালা যায়, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ ডিম বা কৌটোর ছোট্ট ফুটো থেকে সজোরে বাষ্প বার হয়ে ক্রমশঃ সেটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেবে।

## রঙীন ছায়া ও চোখের ধাঁধা

সর্বপ্রথম লাল, নীল, সবুজ, হলদে নানাবর্ণের রঙীন কাচ কিংবা প্লাস্টিকের প্লেট সংগ্রহ করে নিতে হবে। তারপর দুটি মোমবাতি জোগাড় করে এনে অন্ধকার ঘরের সাদা দেওয়ালের কাছে জ্বালতে হবে। এখন মোমবাতি ও দেওয়ালের মাঝখানে একটি কাঠি বা পেনসিল খাড়াভাবে স্থাপন করলে দেখা যাবে দুটি ছায়া পড়েছে। প্রত্যেক মোমবাতি কাছে এনে বা দূরে নিয়ে গিয়ে এমন অবস্থায় রাখতে হবে যাতে পেনসিলের দুটি ছায়াই এক রকম ঘন ও কালো হয়।

এরপর দুটি মোমবাতির মধ্যে কোনো একটির সম্মুখে লাল কাচ রাখতে হবে ; আশ্চর্যের ব্যাপার এই, মোমবাতির অগ্নিশিখা থেকে প্রক্ষিপ্ত পেনসিলের ছায়া লাল বর্ণের না হয়ে সুন্দর সবুজ বর্ণের হবে আর অনাবৃত অন্য মোমবাতির আলোকছায়া লাল রঙেরই থাকবে। এখন যদি লাল কাচের বদলে সবুজ কাচ দিয়ে মোমবাতির

আলোক-শিখা ঢাকা হয়, তাহলে দেওয়ালের গায়ে লাল ও সবুজ দুইরকম ছায়া পড়বে। হলদে কাচ দিয়ে ঢাকলে নীল ও হলদে
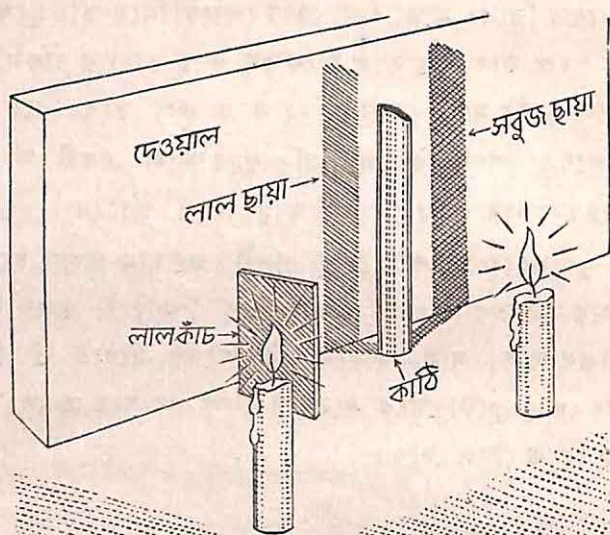
ছায়া হবে। আর নীল কাচের আবরণ দিলে হলদে ও নীল দু রকমের ছায়া দেখা যাবে।

আসল কথা, যে রঙের কাচ মোমবাতির সামনে ধরা হবে তার পরিপূরক (complementary) হিসাবে অন্য রঙ দেওয়ালের গায়ে দেখা যাবে। এই অন্য রঙ কোথা হতে আসে? এই সুন্দর দৃশ্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত ভাল করে কেউ দিতে পারে নি। আমি এই প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকাকে এই বিষয় অনুসন্ধান করতে অনুরোধ করি।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় আমরা আকাশের গায়ে লাল, সবুজ, নীল, হলদে, কমলা—নানা রঙের যে অপরূপ সমাবেশ দেখি তার সমস্তটার হয়ত বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এর কিছুটা হয়ত আমাদের দৃষ্টিবিভ্রমজনিত শারীরিক সৃষ্টি। কারণ, ক্যামেরার সাহায্যে সূর্যাস্ত কালীন রঙীন ফোটো নিয়ে দেখা গেছে, চোখের দেখা আকাশের রঙ আর ফোটোতোলা ছবির রঙ সব সময় এক হয় না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যদি কোনো গাঢ় কমলা রঙের বস্তুর দিকে একদৃষ্টে এক মিনিটেরও বেশি সময় চেয়ে থেকে কোনো সাদা পর্দার ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়, তাহলে দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর ওপর পূর্বদৃষ্ট পদার্থের নীল রঙের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বিশেষ বিশেষ রঙের প্রতিক্রিয়ার ফলে অক্ষিপটে ক্লান্তি জন্মায়, সেজন্য কিছুক্ষণ পরে আমরা তার পরিপূরকরূপে অন্য রঙের আবির্ভাব দেখি।

আমাদের চোখের দেখাটাই যে সবসময় ঠিক নয় তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে মাঝে মাঝে বায়ুস্তরের অসম আলোক প্রতিসরণের ফলে মরীচিকা (mirage) দেখা যায়, যার জন্য পথিকেরা দূর থেকে উষ্ণ শুষ্ক প্রান্তরকে জলপূর্ণ হ্রদ মনে করে।

সিনেমা বায়োস্কোপও একপ্রকার চোখের ধাঁধা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো জিনিস চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেও তার প্রভাব অক্ষিপর্দায় সিকি সেকেণ্ড পর পর্যন্ত থেকে যায়। চলচ্চিত্রে বহু ছবি দ্রুতবেগে পরপর দেখান হয় বলে জীবন্ত ও চলন্ত বোধ হয়।

কোনো অন্ধকার ঘরে ঠিক পাশাপাশি দুটি ছেঁদা দিয়ে আলোকরশ্মি প্রবেশ করতে দিলে একজোড়া উজ্জ্বল আলোকবিন্দু দেখা যাবে। এখন যদি একটি ফুটো লাল রঙের কাচ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে অন্য ফুটো দিয়ে প্রবিষ্ট শ্বেত আলোক-কণাকে সবুজ বর্ণের মনে হবে আর সবুজ কাচ ব্যবহার করলে অপর আলোকরশ্মি রক্তবর্ণের বোধ হবে।

যদি দস্তার সঙ্গে সোনা বা রূপা ছুঁইয়ে অন্ধকার ঘরে অক্ষি-গোলকের সঙ্গে লাগানো হয়, তাহলে দুইটি বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শের জন্য ক্ষীণ বিজলী স্রোতের আবির্ভাবের ফলে চোখের স্নায়ুকোষ উত্তেজিত হয় এবং সেজন্য বিদ্যুৎচমকের মতো দীপ্তি দেখা যায়।

নীচের এই যোগচিহ্নের দিকে পাঁচ মিনিট একদৃষ্টে চেয়ে থাকবার পর কোনো সাদা দেওয়াল কিংবা পর্দার ওপর দৃষ্টিপাত করলে
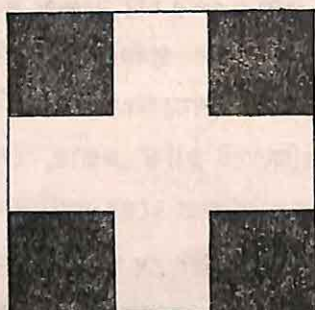
আগেকার ঐ ছবিই কালো রঙের হয়ে আস্তে আস্তে ফুটে উঠবে।

## দিব্যদর্শন

সাধারণ অবস্থায় আমরা কাঠ, কাপড় বা পাথরের মধ্য দিয়ে কিছুই দেখতে পাই না, কারণ এই সব বস্তুর ভিতর দিয়ে আলো যায় না। আবার এক্স-রে রশ্মি চামড়া বা কাঠের ভিতর দিয়ে অবাধে গতায়াত করতে পারলেও পাথর বা ধাতুর মধ্য দিয়ে বিশেষ যেতে পারে না। এখানে এমন একরকম যন্ত্রের কথা বলব, যার সাহায্যে পাথর, ধাতু বা কাঠের মধ্য দিয়েও আমাদের দৃষ্টি অব্যাহত হতে পারে।

ছবিতে যেরকম আছে ঠিক সেভাবে কাঠের তক্তা বা কার্ডবোর্ডের সাহায্যে একটা আঁকা-বাঁকা সরু লম্বা বাক্স বা নল তৈরি করতে হবে।
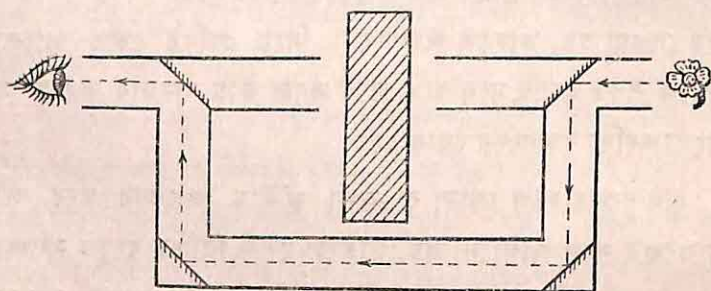
তারপর চারখানি ছোট ছোট আর্শি ৪৫° হেলিয়ে চোঙার ভিতর বিশেষ

বিশেষ জায়গায় বাঁকের মুখে আটকে দিতে হবে। এখন ঐ নলের মাঝখানে একটা ইট বা পাথর বা বই রেখে একদিকে কোনো ফুল ধরে অন্য পাশ দেখলে বেশ দেখা যাবে, কোনো অসুবিধাই হবে না। যন্ত্রটি সুকৌশলে করতে পারলে বড়ই সুন্দর ও আশ্চর্যজনক হয়।

লোকে এর গুপ্ত প্রক্রিয়া না জানলে কিছুতেই ধরতে পারবে না। আসল কথা, আলোকরশ্মি ঐ ফুল থেকে বিকীর্ণ হয়ে নলের মধ্যে যায় আর প্রথম আর্শি থেকে দ্বিতীয় আর্শি, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এবং তৃতীয় থেকে চতুর্থ আর্শিতে প্রতিফলিত হয়ে একেবারে দর্শকের চোখের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে বলে সে সবই দেখতে পায়।

## রঙীন চাক্‌তি

বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে আবিষ্কার করেন যে, সাধারণ সাদা আলো এক নয়, সাত রঙের সমষ্টি মাত্র। তাঁর এই
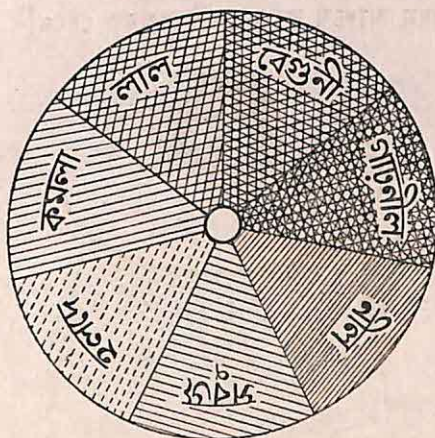
সিদ্ধান্ত এই পরীক্ষার দ্বারা সুন্দরভাবে প্রমাণ করা যায়। একটি সাদা কার্ড নিয়ে তাই থেকে গোলকরে দেড় ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি চাকতি কেটে নিতে হবে। কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে লাইন টেনে টেনে চাকতিটিকে সমানভাবে সাত ভাগে বিভক্ত করে দিতে হবে।

এখন রঙীন পেনসিল নিয়ে যথাক্রমে—বেগুনী, গাঢ় নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল এই সাতরকম রঙ দিয়ে সাতটি ভাগ রঞ্জিত করে নিতে হবে। তারপর চাকতির মাঝখানে একটি দেশলাই-এর কাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে ওটা ঘূর্ণীর মতো ঘোরালেই আলাদা আলাদা সাত রঙ এক হয়ে গিয়ে ফিকে ধূসর বর্ণের বলে মনে হবে।

## কাটা মুণ্ডুর কথা বলা

মাথাটাকে ধড় থেকে কেটে ফেললেই তো মানুষটা মরে যায়। অথচ মুণ্ডুটা বেঁচে ওঠে, জিভ বার করে ভেংচি কাটে, চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে দেখে, আবার তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তরও দেয়, এমন আজগুবি কথা কেউ কখনও শুনেছ কি ?

এখন কৌশলটা অনেকের হয়তো জানা হয়ে গেছে বলে কাণ্ডটা ভুতুরে বলে মনে হয় না, কিন্তু ১৮৬৫ সালে কর্নেল স্টডেয়ার প্রথমে যখন এই খেলা দেখান তখন লণ্ডন শহরে হৈ হৈ কাণ্ড পড়ে গিয়েছিল। এমন আশ্চর্য কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি তার আগে।

শুধু একটা টেবিল। তার উপর ধড়হীন একটা জীবন্ত মুণ্ড চুপ করে একজায়গায় পড়ে আছে। টেবিলের মোটে তিনটে পায়া।

টেবিলের গায়ে কোনো ঢাকা নেই। টেবিলের নীচে সবটা ফাঁকা তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। অথচ টেবিলের ওপর মুণ্ডটিকে যে যা প্রশ্ন করছে সে অবলীলাক্রমে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

এতে কার না বিস্ময় জাগে!

অথচ কৌশলটা জানলে এটা তোমরা বাড়িতেও করতে পার, আর ধড়হীন মাথাকে দিয়ে কথা বলিয়ে সকলকে চমকে দিতে পার।

যাতে তোমরা তা করতে পার সেইজন্যে কৌশলটা বলে দিচ্ছি।

একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মেঝেতে কালো কাপড় পাত। তার ওপর একটি তিনপায়া টেবিল রাখ। টেবিলের মাঝখানে গোল গর্ত করা থাকবে। জাদুকরের সহকারী টেবিলের নীচে একটি ছোট টুলে বসে এই গর্তর মধ্য দিয়ে নিজের মাথাটুকু শুধু বার করে রাখবে। টেবিলের চারদিক সমান উঁচু কালো রঙের পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে আর সামনের দু'পাশের পায়ার সঙ্গে দুটি আরশি আটকানো থাকবে, যেমন ছবিতে আছে। এই আরশি দুখানিতে বসে থাকা সহকারীর শরীর আড়াল পড়বে। দুটি আয়নাই এমনভাবে বসানো থাকে যে তাতে কেবল মেঝে ও চারপাশের কালো কাপড়ের প্রতিফলন দেখা যায়। তাইতে মনে হয় যেন টেবিলের তলাটা সত্যই শূন্য।

## হলদে আলো

কোনো অন্ধকার ঘরে একমুঠো লবণ নিয়ে একটি ডিসে রেখে তার ওপর মেথিলেটেড স্পিরিট ছড়িয়ে দিয়ে আগুন জ্বালালে হলদে রঙের আলো উৎপন্ন হয়। কিংবা, ঘর অন্ধকার করে একটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে তার মধ্যে তারে করে এক টুকরো সৈন্ধব লবণ ধরলে সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখার রঙ হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। এর কারণ সাধারণ লবণে সোডিয়াম নামক ধাতু থাকে, যেটা পীতবর্ণ উৎপাদক। এই হলদে আলোর অদ্ভুত গুণ। এর সামনে লাল রঙের জিনিস ধরলে হলদে দেখাবে, নীল রঙের বস্তু রাখলে কালো মনে হবে আর সমবেত ব্যক্তিবর্গের চোখমুখ অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাশে বোধ হবে।

## মাছের খেলা

আমাদের চোখের সামনে থেকে কোনো বস্তু সরিয়ে নিলেও তার প্রতিচ্ছবি অক্ষিপর্দায় এক-সেকেণ্ডের এক দশমাংশ সময় পর্যন্ত রয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া সিনেমা বায়োস্কোপে কাজে লাগানো হয়েছে। এখানে এই সম্পর্কে একটা মজার পরীক্ষার কথা বলছি। একটা চারচৌকা কার্ড নিয়ে তার এক দিকে একটা মাছ আর অন্য দিকে একটি গোলাকার কাচের আধার আঁকবে। এরপর যদি ঐ কার্ডের
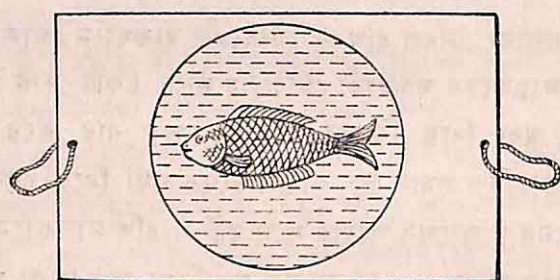
দুপাশে দুটি সুতা বেঁধে জোরে জোরে ঘোরানো হয় তাহলে দেখবে ঐ মাছ গোলাকার জলাধারে এসে সাঁতার কাটছে। এইভাবে কার্ডের একদিকে একটা পাখির ছবি আর ঠিক অন্য দিকে একটা খাঁচা এঁকে নিয়েও আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম পরীক্ষা করা যেতে পারে। তখন কার্ড ঘোরালে মনে হবে পাখিটা খাঁচার ভেতর এসে বসে আছে।

## দৃষ্টিবিভ্রম

এখন কয়েক রকম চোখের ভুলের কথা বলছি। পরের পৃষ্ঠায় এক নম্বর ছবিতে ষোলটি ছোট ছোট চতুষ্কোণ পাশাপাশি সাজানো আছে। ভালো করে প্রত্যেকবার লক্ষ্য করলে দেখবে চার-চৌকার ঠিক মাঝখানে ফিকে ধূসরবর্ণের বিন্দু দেখা যাচ্ছে, যদিও তার বাস্তব অস্তিত্ব মোটেই নেই, তবে সব বর্গক্ষেত্রগুলিই ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হওয়া চাই, তাহলেই এই দৃষ্টিবিভ্রম ঠিকভাবে উৎপন্ন হবে।

এবার দু'নম্বরের সবুজ বৃত্তের দিকে তিন মিনিট ধরে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে যদি কোনো সাদা কাগজের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়, তাহলে ফিকে গোলাপী রঙের এক গোলক আস্তে আস্তে সেখানে ফুটে উঠবে। এই রকমভাবে তিন নম্বর ছবির কমলা রঙের বৃত্তের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থাপন করে, কোনো সাদা কাগজের ওপর চোখ ফেরালে নীল রঙের গোলক দেখা যাবে।
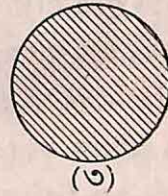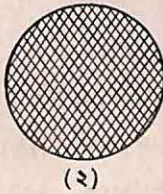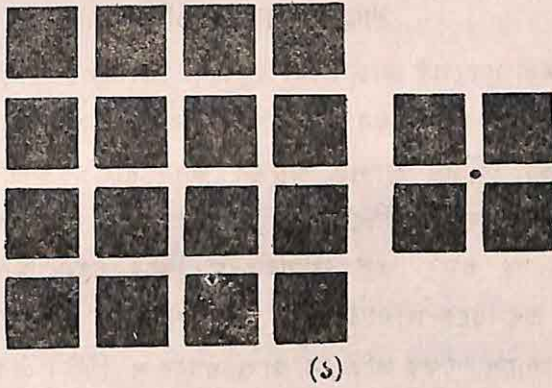
সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে চার নম্বর ছবির কুচকুচে কালো কঙ্কাল মূর্তি। এর দিকে কয়েক মিনিট একমনে চেয়ে থেকে যদি ঘরের

সাদা দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করা যায়, তাহলে একটা সাদা কঙ্কালের মুণ্ড ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠবে। দেখো, তোমরা যেন ভূতের এই ছায়াছবি দেখে ভয় পেয়ে যেও না।

আসল কথা কোনো জিনিসের দিকে খানিকক্ষণ একভাবে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে আমাদের অক্ষিপট ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর সেজন্য তারপর আমরা তার পরিপূরক হিসাবে অন্য রঙ দেখতে আরম্ভ করি।

## শব্দের সহানুভূতি

তোমরা সকলেই জানো যে, কোনো জিনিসের কাঁপুনি থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়। যখন কোনো ঘণ্টা বাজে, তখন তাতে হাত দিলেই এই স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়। ঘণ্টার কাঁপুনি চারিপাশের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে আর তার ফলে বায়ুতেও একরকম কম্পন উৎপন্ন হয়। এই কম্পনতরঙ্গ গিয়ে যখন অন্য কোনো লোকের কর্ণপটহে আঘাত করে তখন শব্দরূপে সে তা' শুনতে পায়। বাতাসে শব্দের গতি সেকেণ্ডে এগার শ' ফিট। এক সেকেণ্ডে কুড়ি হইতে কুড়ি হাজার পর্যন্ত কম্পন হলে তবেই সেটা মানুষের শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে।

দুটি জিনিসের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা যদি একই হয়, তাহলে একটিতে আঘাত করে শব্দ করলে, সেই শব্দতরঙ্গ বাতাসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে অন্য জিনিসটিকে জোর করে কাঁপিয়ে দেবে এবং তা' থেকেও তখন একরকম মৃদু শব্দ হতে আরম্ভ হবে। একে সহানুভূতির শব্দ বলা হয়। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি তার যদি একই সুরে বাঁধা থাকে তাহলে একটিতে আঘাত করে সুর তুললে অন্য তারটি সেই সঙ্গে নিজে থেকেই বাজতে থাকে। পিয়ানোফোর্ট নামক বিলেতী বাদ্যযন্ত্রের কাছে এসে কোনো গায়ক গান ধরলে ঐ যন্ত্রের মধ্যে-কার সেই সুরে বাঁধা তারগুলি তখন আপনা হতেই কাঁপতে থাকে।

সুরের কাঁটা বা tuning fork বলে একরকম যন্ত্র আছে। এতে আঘাত করলে সুমধুর স্বর উৎপন্ন হয়। একরকম কাঁটা

এক একরকম সুরে বাঁধা থাকে। একটি সরু লম্বা কাচের বোতল নিয়ে তার মধ্যে একহাতে ধীরে ধীরে জল ঢালতে ঢালতে অন্য হাতে একটি টিউনিং ফর্ক ধরে তার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বাজাতে হয়, এতে দেখা যায় বোতলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল প্রবেশ করলেই ঐ টিউনিং ফর্কের আওয়াজ হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে, কারণ তখন ঐ বোতলের ভেতরকার বাতাসের স্বাভাবিক কম্পন-সংখ্যা আর টিউনিং ফর্কের কম্পন-সংখ্যা একেবারে এক হয়ে গেছে অর্থাৎ দুটোই তখন এক সুরে বাঁধা। বোতলের মুখে ফুঁ দিলেও তখন সেইরকম স্বর শোনা যাবে। বোতলের মুখের কাছে কিন্তু অন্য কোনো টিউনিং ফর্ক বাজালে শব্দের জোর বাড়বে না।

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক হেলম্‌হোজ (Helmholtz, ১৮২১-১৮৯৪) এক প্রকার ফাঁপা বল আবিষ্কার করেছিলেন। এই সব গোলকের দুই দিকে দুটি ফুটো থাকত। এক একটি বল কেবল এক রকম সুরে সাড়া দিত। এক পাশের ফুটোয় কান রেখে কোনো বাজনা শুনলে দেখা যেত কোনো নির্দিষ্ট সুর হলেই বলের থেকে তা বেশ জোরে শোনাত।

কাচের বোতল নিয়ে আর একরকম পরীক্ষা করা যেতে পারে। কোনো বড় বোতলের মুখে জোরে ফুঁ দিলে একরকম শব্দ বার হয়, এটা সবাই লক্ষ্য করেছ। এখন যদি বোতলটি মুখের কাছে ধরে উঁ-উঁ-উঁ করে ঠিক সেই শব্দের অনুকরণ করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভেতরকার বাতাস কাঁপতে আরম্ভ করেছে, এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু অন্য কোনো স্বরে বোতলের বাতাসের কোন পরিবর্তনই ঘটে না। একবার রেডিওতে যখন গান হচ্ছিল, তখন একটু দূরে হাতে একখানি ভারি মনস্তত্ত্বের বই নিয়ে বসেছিলুম। দেখা গেল রেডিওতে একটা নির্দিষ্ট সুর হতে আরম্ভ হলেই হাতের বইটি কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এও সহানুভূতিসূচক কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই প্রসঙ্গে এবার এই জাতীয় সবচেয়ে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলব। তোমরা যারা স্কুলে বা কলেজে ল্যাবরেটরিতে কাজ কর, তারা সহজেই এটা করে দেখতে পার। প্রথমে একটি কাচের সরু নল জোগাড় করে তাপপ্রয়োগে তার একদিক এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক এক ভাগ সমান সূচাল করে নিতে হবে। বাজারে যে ড্রপার পাওয়া যায়, তা থেকে কাচের নলটি খুলে নিলেও চলবে। এখন জ্বালানি গ্যাস সরবরাহের সঙ্গে এই কাচের নল যোগ করে নিয়ে আগুন জ্বালালে তা' থেকে খুব লম্বা লম্বা ও পাতলা শিখা বার হতে থাকবে। এবার এই অগ্নিশিখার কাছে জোরে কোনো বাঁশী বাজালেই ঐ শিখা তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে গিয়ে চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আসল কথা বাঁশী থেকে ধ্বনি-তরঙ্গ গিয়ে এই অগ্নিশিখাকে সজোরে আঘাত করে আর তার ফলে সেটা মুহূর্তের জন্য স্থানচ্যুত হয়ে যায়। এজন্য এর নাম অনুভূতিসম্পন্ন অগ্নিশিখা ( sensitive flame )

কখনও কখনও শোনা যায় কোনো কোনো শক্তিশালী লোকের প্রবল কণ্ঠস্বরে কাচের ছোট্ট পেয়ালা হঠাৎ চিড় খেয়ে গেছে। আমরা সকলেই জানি কামান গর্জনের সময় প্রবল শব্দতরঙ্গ এক এক সময় ঘরের জানালার সমস্ত কাচ ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেলে দেয়। বর্ষাকালে আকাশে জোরে মেঘ গর্জন হলেই কাচের জানালা কিরকম কাঁপতে থাকে তা' সকলেই প্রত্যক্ষ করেছ।

দুটি ঢাক যদি একই শব্দে বাঁধা থাকে তাহলে একটি ঢাকের ওপর পয়সা রেখে তার পাশে অন্যটি বাজালে ঐ পয়সা নাচতে থাকবে।

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে এভারেস্ট অভিযানের সময় যাতে এঞ্জিনের শব্দের প্রতিঘাতের ফলে বরফের ধস নেমে এসে অভিযাত্রীদলকে কোনোরকম বিপন্ন করতে না পারে সেজন্য ভারতীয় বিমানবহর কয়েকদিনের জন্য আকাশের ঐ অঞ্চলে এরোপ্লেন ওড়া সম্পূর্ণ বন্ধ রেখেছিলেন।

## কাগজ থেকে বিদ্যুৎ

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীস দেশের মহাপণ্ডিত থেলসের জানা ছিল যে তৈলস্ফটিকের ( amber ) ওপর রেশম ঘষলে তার খড়, পালক ও অন্যান্য হালকা বস্তুর কণা আকর্ষণ করবার ক্ষমতা জন্মায় এবং সেজন্য তৈলস্ফটিকের গ্রীক নাম ইলেক্ট্রন থেকে আধুনিক ইলেকট্রিসিটি কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। এর প্রায় ছ' শতাব্দী পরে পণ্ডিতপ্রবর প্লিনি লেখেন—আঙ্গুলের ডগায় তৈলস্ফটিক ঘষার ফলে ওতে যখন তাপরূপে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয় তখন এই জিনিসটি খড়ের কণা আকর্ষণ করে। যেমনভাবে চুম্বক-প্রস্তর লৌহখণ্ডকে নিজের কাছে টেনে থাকে।

প্রাচীন যুগে বিজলী সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছুই জানা ছিল না। মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের রাজবৈদ্য ডাক্তার গিলবার্ট প্রমাণ করে দেখান যে. শুধু তৈলস্ফটিকই নয়—গালা, গন্ধক, কাচ, মোম প্রভৃতি নানারকম দ্রব্যই রেশম-পশমের দ্বারা ঘর্ষিত হলে হালকা বস্তুর কণা আকর্ষণ করবার শক্তি অর্জন করে। তিনিই প্রথম ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ কথাটি ব্যবহার করেন। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিক বেঞ্জামিন প্রচার করেন যে, বিদ্যুৎ দু' রকমের হয়—ধন-বিদ্যুৎ বা ফ্রাঙ্কলিন পজিটিভ ইলেকট্রিসিটি ও ঋণ-বিদ্যুৎ বা নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি।

এবার এ সম্পর্কে একটা মজার পরীক্ষার কথা বলব, যেটা সবাই বাড়িতে বসে সহজে করে দেখতে পার। প্রথমে বড় আকারের এক-খানি বাদামী কাগজ জোগাড় করে আনতে হবে—যে কাগজ দিয়ে সচরাচর জিনিসপত্র মোড়া ও ঠোঙা তৈরি হয়। এবার ঐ কাগজটি নিয়ে প্রায় চার ইঞ্চি চওড়া ও যথেষ্ট লম্বা রেখে সমানভাবে কয়েক পাট করে নিতে হবে। এরপর ঐ কাগজখানি আগুনের সামনে ধরে খুব ভাল করে গরম করে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার করবে কি, গরম কোট পরে বাঁ হাত দিয়ে কাগজের ফালিটি গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে সেটা সজোরে টান দেবে। গরম কাপড়ের সঙ্গে

প্রবল ঘর্ষণের ফলে এই কাগজে তখন প্রচুর স্থিরবিদ্যুৎ জন্মাবে। এখন যদি এর কাছে হাতের আঙ্গুল আনা হয়, তাহলে প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা নীল রঙের বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হবে। এমন কি এর সাহায্যে গ্যাস ও স্পিরিটে আগুন ধরানো সম্ভব। কারুর মাথার কাছে এই বিদ্যুতাবিষ্ট কাগজ ধরলে তার চুলগুলি সোজা খাড়া হয়ে উঠবে।

বলাবাহুল্য যে, এই পরীক্ষা শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালেই ভাল হয়, যখন আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে। বর্ষাকালে ভিজে বাতাসে এই পরীক্ষা করতে যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা।

এই প্রসঙ্গে এখানে আর একটা মজার ব্যাপার বলছি। কোনো লোককে কাচ, রবার বা অন্য কোনো অপরিচালক বস্তুর ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিট তার গায়ে যদি রেশম, পশম বা রবার ঘষা হয়, তাহলে তার শরীরে বিলক্ষণ বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়—এটা ইলেক-ট্রোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেখানো যায়। তখন মাটিতে দাঁড়িয়ে যদি আর একজন লোক নিজের আঙ্গুল তার হাতের কাছে আনে, তাহলে ছোট্ট বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়।

## লেবুর ব্যাটারি

বাড়িতে বসে খুব সহজে একটি পাতিলেবু দিয়ে বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তৈরি করবার উপায় বলছি। প্রথমে একটা আস্ত লেবু নিয়ে একটু থেঁতো করে নিতে হবে, তারপর তার মধ্যে একটা তামার তার বা পাত ঢুকিয়ে দিয়ে আর এক পাশে একটা লোহার ছুরি* প্রবেশ করাতে হবে। এখন অন্য একটি তার নিয়ে লেবুতে লাগানো তামার তার ও লোহার ছুরির সঙ্গে যোগ করলেই তার মধ্যে দিয়ে বিজলী প্রবাহ চলতে থাকবে। এই রকমভাবে কয়েকটি লেবু একসঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা করলে বিদ্যুতের জোর নিশ্চয়ই বেশি হবে। আর তখন একটি ছোট্ট টর্চের বাল্ব জ্বালানো সম্ভব হতে পারে।

* ছুরির বদলে দস্তার পাত দিলে আরও ভাল ফল হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ইতালিয়ান বৈজ্ঞানিক আলেকজাণ্ডার ভল্টা ( ১৭৪৫-১৮২৭ ) আর একপ্রকার সরল বৈদ্যুতিক ব্যাটারি আবিষ্কার করেছিলেন, একে ভল্টার স্তূপ বলা হয়। তিনি করেছিলেন কি, পরপর অনেকগুলি দস্তার চাক্‌তি ও তার সঙ্গে তামা বা রূপার চাক্‌তি জোড়া করে সাজিয়েছিলেন, উভয়ের মাঝখানে থাকত একটা করে লবণ-জলসিক্ত কার্ডবোর্ড বা চামড়ার চাক্‌তি। সবশেষে এই রকম ব্যাটারির উভয়প্রান্ত তার দিয়ে যোগ করলেই বেশ বিদ্যুৎ চলাচল করত। এই জাতীয় ব্যাটারি এখনও করে দেখা যেতে পারে—তামার চাক্‌তি, চামড়ার চাক্‌তি ও দস্তার চাকতি আবার তামার চাক্‌তি, চামড়ার চাক্‌তি ও দস্তার চাক্‌তি—এইভাবে সাজিয়ে।

আসল কথা যে, কোনো দুটি ধাতু একত্র করলেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, যদি তাদের মাঝখানে রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপাদনের জন্য কোনো এক তরল বস্তুর অস্তিত্ব থাকে।

একখণ্ড সোনা কিংবা রূপা এক টুকরা দস্তার সঙ্গে ছুঁইয়ে যদি জিবে লাগানো যায়, তাহলে ঈষৎ অম্ল একপ্রকার আস্বাদ পাওয়া যায়, এটা হয় দুটি বিভিন্ন ধাতুর সংস্পর্শজনিত ক্ষীণ বিদ্যুৎস্রোত সৃষ্টির জন্য।

## জল বিশ্লেষণ

তোমরা সকলেই জানো প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল, জল মৌলিক পদার্থ। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ রাসায়নিক হেনরী ক্যাভেণ্ডিস প্রমাণ করে দেখান যে, দুভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন একত্র করে তাতে আগুন লাগালে বিস্ফোরণ ঘটে আর সেই সঙ্গে বিন্দু বিন্দু জল উৎপন্ন হয়। এ হলো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া। এরপর ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নিকলসন ও কারলাইল নামে দুজন বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে জল বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন করেন।

তাঁদের এই পরীক্ষা-ঘরে বসেও আবার করে দেখা যেতে পারে।

এক গেলাস জল নিয়ে তার মধ্যে একটু লবণ ফেলে দিতে হবে, যাতে করে ঐ জল বিদ্যুতের ভালো পরিচালক হয়ে যায়। তারপর একটি ব্যাটারির দুই পাশে দুটি তার লাগিয়ে অপর প্রান্ত দুটি গেলাসের মধ্যে কাছা-কাছি করে কিন্তু না ঠেকিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে। এর পরেই প্রত্যেক তারের
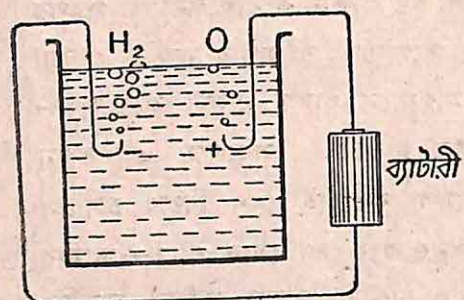
আগা থেকে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকবে। যে তার থেকে বেশি বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে সেটা নেগেটিভ দিক আর যেখান থেকে কম বুদ্‌বুদ্‌ বার হয় সেটা পজিটিভ দিক। হাইড্রোজেন গ্যাস নেগেটিভ প্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয় আর অক্সিজেন গ্যাস পজিটিভ প্রান্ত থেকে সৃষ্টি হয়। এই ভাবে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। একটির বদলে একাধিক ব্যাটারি ব্যবহার করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়। টেস্ট টিউবে জল ভরে গেলাসের মধ্যে তারের ওপর উপুড় করে ধরলে সহজেই ঐ সব গ্যাস সংগ্রহ করা সম্ভব।

## চুম্বকের মজা

তোমরা সবাই জানো প্রত্যেক চুম্বকের দুইটি দিক থাকে—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। একটা চুম্বকের উত্তর মেরুর কাছে অন্য চুম্বকের দক্ষিণ মেরু আনলে পরস্পরের মধ্যে একরকম টান বা আকর্ষণ দেখা যায় আর তার নিকটে অন্য চুম্বকের উত্তর মেরু আনলে উভয়ের ভিতর বিকর্ষণ ঘটে অর্থাৎ তখন একে অপরকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। চৌম্বক বিজ্ঞানের এই তথ্য কাজে এনে একটা সুন্দর খেলনা তৈরি করা যেতে পারে।

প্রথমে একটা কাগজ কিংবা হালকা কাঠের ছোট্ট নৌকা তৈরি করে নিতে হবে। তারপর তার মাঝখানে মাস্তুলের মতো করে খাড়াভাবে একটা চুম্বকদণ্ড এনে বসিয়ে দিতে হবে, এরপর কাগজ

কিংবা কাপড়ের একখানি ক্ষুদ্র পাল প্রস্তুত করে সেটার সঙ্গে লাগিয়ে এমন করে ঢেকে দিতে হবে যাতে সেটার অস্তিত্ব পর্যন্ত বোঝা না যায়। এবার একটি কাগজের বা কার্ডবোর্ডের নলের মধ্যে আর একটি চুম্বকদণ্ড ভরে ঐ নৌকার কাছে আনলে বড় আশ্চর্য এক ব্যাপার দেখা যাবে—যখন উভয় চুম্বকের মেরু দুটি একই প্রকার হবে, তখন নৌকা দূরে সরে যাবে, আর যখন চুম্বক দুটির মেরুদ্বয় বিপরীত-ধর্মী হবে তখন নৌকা কাছে চলে আসবে। এই ব্যাপার নিজের ইচ্ছামতো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ছোট্ট নৌকাটি আজ্ঞামতো একবার কাছে আসবে আর আবার দূরে সরে যাবে।

চুম্বকদণ্ড সহজে সংগ্রহ করতে না পারলে একটা মোটা স্থূচ কিংবা কয়েকটি ছোট ছোট স্থূচ একসঙ্গে করে তাদের ওপর দিয়ে একদিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত বারবার একটা জোরালো চুম্বক ঘষে নিলেও কাজ-চলা-গোছ চুম্বক শলাকা প্রস্তুত হয়ে যাবে। নৌকার বদলে সোলা বা সেলুলয়েডের হাঁসও ব্যবহার করা যেতে পারে।

## বৈদ্যুতিক চুম্বকের খেলা

তোমরা সকলেই জানো যে চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে আর সুতা বেঁধে ঝুলিয়ে দিলে উত্তর-দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে। এখন এই চুম্বক দুই রকমের হয়—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। স্বাভাবিক আকরিক লোহা অনেক সময় চৌম্বক গুণসম্পন্ন হয় আর এই প্রকার লোহাকে অয়স্কান্ত শিলা বা লোডস্টোন বলা হয়। অয়স্কান্ত লোহার চুম্বকশক্তি খুবই দুর্বল, কারণ তাদের এই ক্ষমতা পৃথিবী থেকে পাওয়া। সেজন্য কৃত্রিমভাবে চুম্বক তৈরি করে নেওয়া হয়ে থাকে। এই সব চুম্বকের জোর খুব বেশি।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে কোপেনহেগেনের বিজ্ঞান-অধ্যাপক অয়ারস্টেড সর্বপ্রথম পরীক্ষা করে দেখান যে কোনো তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে সেটার কাছে কম্পাস-কাঁটা বা চৌম্বক শলাকা আনলে ঐ কাঁটায় বিশেষ বিপর্যয় দেখা দেয়। এছাড়া যদি অনাবৃত তামার

তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎস্রোত চালিয়ে সেই তার লৌহচূর্ণের মধ্যে স্থাপন করা হয়, তাহলে চুম্বকের মতোই ঐ বিদ্যুৎযুক্ত তামার তার লৌহকণাগুলি আকর্ষণ করে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতের সঙ্গে চৌম্বক শক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যেখানেই বিদ্যুতের অবস্থিতি সেখানেই চুম্বকের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।
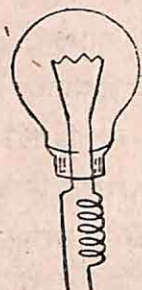
একটি লৌহদণ্ডের চারপাশে রবারমোড়া তামার তার যদি অনেক পাক জড়িয়ে নিয়ে ঐ তারের কুণ্ডলীতে বিজলী-স্রোত চালানো যায়, তাহলে কেন্দ্রস্থ সেই লৌহদণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হবে। এই প্রকার বৈদ্যুতিক চুম্বকের ক্ষমতা নির্ভর করবে তারের পাকের সংখ্যার উপর আর বিজলী-স্রোতের আম্পিয়ার শক্তির উপর। এছাড়া মধ্যেকার লোহা যত মোটা হবে, চৌম্বক শক্তিও তত বেশি হবে। কুণ্ডলীর ভিতরকার লোহা ইস্পাত হলে বিদ্যুৎচালনার ফলে সেটি স্থায়িভাবে চুম্বকে পরিণত হবে, কিন্তু নরম লোহা হলে ওটি চুম্বক থাকবে ঠিক ততক্ষণ, যতক্ষণ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎস্রোত প্রবাহিত হবে।

এবার এরকম একটি বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে কিভাবে মজার মজার খেলা দেখানো যায়, তার বিষয় বলব। এই চুম্বক তোমরা নরম লোহার গায়ে অনেক পাক প্ল্যাস্টিক-মোড়া তার জড়িয়ে তৈার করে নিতে পারবে, কিংবা পুরানো জিনিসের দোকান থেকে সংগ্রহ করে নিতে সমর্থ হবে।

## বরফের উপর ডিম ভাজা

সে আবার কি ? আজকাল বৈজ্ঞানিক যুগে সবই সম্ভব। এই পরীক্ষার জন্য একটি লৌহকেন্দ্রযুক্ত বৈদ্যুতিক চুম্বক যোগাড় করে কোনো টেবিলের নীচে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর ছয় ইঞ্চি মোটা একটি বরফখণ্ড এনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিয়ে তার উপর আবার

তামার প্যান রাখতে হবে। এবার তামার কড়ার মধ্যে ডিম ছেড়ে দিয়ে দর্শকবৃন্দের অজ্ঞাতসারে তারের কুণ্ডলীর ভিতর বিচলিত বিদ্যুৎস্রোত (alternating current) চালিত করতে হবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে রহস্যজনকভাবে ডিম-ভাজা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে হলে বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয় তামার কড়া হ'ল গিয়ে বিচলিত বিদ্যুৎপরিবর্তনকারী (alternating current transformer)
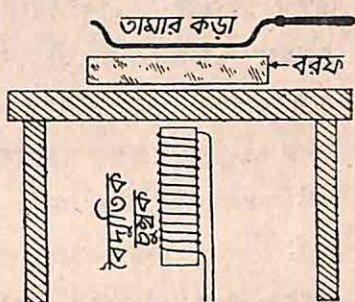
দ্বিতীয় কুণ্ডলী আর বৈদ্যুতিক চৌম্বক লোহার চারিপাশের তার হ'ল প্রাথমিক কুণ্ডলী। সাধারণ ভাষায় টেবিলের নীচেকার বৈদ্যুতিক চুম্বক টেবিল ও বরফের মধ্য দিয়ে তামার কড়াকে বিদ্যুতাবিষ্ট করে, তার ফলে তামার পাত্রটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে। টেবিলের তলায় যতক্ষণ বিদ্যুৎ চলাচল করবে, ততক্ষণ তামার কড়ায় হাত দেওয়া চলবে না। নীচেকার বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তবেই কড়া ছোঁয়া উচিত।

## বিচ্ছিন্ন বাল্বে আলো জ্বালানো

এর জন্যও পূর্বোক্ত প্রকার বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবস্থা থাকা দরকার। প্রথমে একটি বাল্বের সঙ্গে প্রায় ১৫০০ পাকযুক্ত তারের কুণ্ডলী সংযুক্ত করতে হবে। এই তারের কুণ্ডলীটি সুকৌশলে কাঠের আবরণে ঢেকে রাখতে হবে, যাতে কেউ দেখতে না পায়। উল্লিখিত বৈদ্যুতিক চুম্বকে বিচলিত বিদ্যুৎ (alternating current) সঞ্চালিত করে তার কাছে কুণ্ডলীযুক্ত বাল্বটি আট-নয় ইঞ্চির মধ্যে আনলেই তাতে তড়িৎ সঞ্চার হবে যার ফলে বাল্বটি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠবে। সকলেই বিনা তারে বাল্ব জ্বলতে দেখে অবাক্ হয়ে যাবে।

## বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাসী জাদুকর রবার্ট হুডিন ( ১৮০৫-১৮৭১ ) বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে বড় সুন্দর খেলা দেখাতেন। তিনি একটি লোহার সিন্দুক নিয়ে গিয়ে দর্শকদের সামনে স্থাপন করে ঘোষণা করতেন যে, ঐ বাক্সটি তাঁর ইচ্ছামতো ভারী কিংবা হাল্‌কা হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ অনুসারে সিন্দুকটি যখন লঘু হয়ে যেত, তখন একটি শিশুও অনায়াসে তুলতে পারত, আর তাঁর আজ্ঞামতো ওটি যখন ভারী হত, তখন সবচেয়ে শক্তিশালী লোকের পক্ষেও সেটি ওঠানো অসম্ভব হয়ে পড়তো। হুডিন এই ম্যাজিক কখনও কখনও অন্য ভাবেও প্রদর্শন করতেন। তিনি সমবেত দর্শক-বৃন্দকে লক্ষ্য করে বলতেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বাপেক্ষা বলশালী লোকেরও শক্তি হরণ করে নিতে পারেন, যার ইচ্ছা সে এসে বাক্স তুলে পরীক্ষা করে দেখে নিক।

আসল কথা দর্শকদের অজ্ঞাতসারে আগে থাকতেই যে জায়গায় লোহার সিন্দুক রাখা হত—তার নীচে একটি প্রবল শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক চুম্বক লুকানো থাকত, তাতে অবিচলিত বিদ্যুৎ (direct current) সঞ্চালিত করলেই লোহার সিন্দুক ওঠান যে কোনো মানুষের পক্ষে অসাধ্য হয়ে যেত।

দেখতে খুব সুন্দর হলেও তোমাদের পক্ষে এই পরীক্ষা তিনটি করা একটু শক্ত মনে হবে। তবে এখানে এর অন্তর্নিহিত কৌশল এজন্য বিশদভাবে বলে রাখলাম যাতে সুবিধামতো কখনও কোনো অভিজ্ঞ বিদ্যুৎবিশারদের সাহায্য পেলে তাঁর তত্ত্বাবধানে তোমরা এসব করে দেখতে পার।

## মমির হাত

যাদুকরেরা কখনও কখনও বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে আর এক রকম আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে থাকেন। এর নাম মমির হাত।

প্রথমে প্ল্যাস্টার কিংবা জমানো কাগজ দিয়ে তৈরি একখানি হাত এনে সকলের সামনে টেবিলের ওপর রাখা হয়। তারপর দর্শকদের মধ্য থেকে কেউ একজন এসে স্টেজের ভেতর বোর্ডের ওপর কোনো অঙ্ক লিখে দেন। কিছুক্ষণ পরে কোনো অলৌকিক শক্তিবলে ঐ হাতখানি সজীব হয়ে ওঠে আর ঠক্ ঠক্ শব্দ করে নির্ভুলভাবে অঙ্কের উত্তর বলে দেয়।

আসলকথা দর্শকবৃন্দের অজ্ঞাতসারে বিদ্যুতের সহায়তায় ঐ হাতে শক্তি সঞ্চার করা হয়। হাতের মধ্যে একটি ইস্পাতের দণ্ড লুকানো থাকে আর টেবিলের নীচে বৈদ্যুতিক চুম্বকের ব্যবস্থা রাখা হয়। জাদুকরের সহকারী আড়াল থেকে কোনো ব্যাটারিতে তার সংযোগ করে ইচ্ছামতো ঐ বৈদ্যুতিক চুম্বককে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় করে। এর ফলে হস্তমধ্যস্থ ইস্পাতখণ্ডটি এক একবার আকৃষ্ট হয়, আর তার জন্যই হাতখানি ওঠা-নামা করে। এইভাবেই অঙ্কের উত্তর দেওয়া হয়ে থাকে।

## ধোঁয়ার কুণ্ডলী

সর্বপ্রথম একটি ঢাকনাশুদ্ধ কার্ডবোর্ডের তৈরি বাক্স জোগাড় করে নিতে হবে। তারপর তার ঢাকনার গায়ে একপাশে এক নয়া পয়সার প্রায় সমান বড় গোল একটি গর্ত করে ফেলতে হবে। এবার ঐ বাক্সের মধ্যে ধূপ জ্বেলে তার ওপর ঢাকনা চাপা দিতে হবে। এখন যদি এই বাক্সের পাশে মৃদু মৃদু টোকা দেওয়া হয়, তাহলে দেখবে আঙটির মতো গোল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উপরে উঠে ক্রমশঃ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে বায়ু প্রবাহহীন স্থানে এই পরীক্ষা করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়।

## চাল ও ছুরি

হিন্দু বাজীকরেরা কখনও কখনও চালভরা ভাঁড় বা ঘটি ও একটি ছুরি নিয়ে বড় আশ্চর্য এক খেলা দেখায়। তারা করে কি, চালভর্তি ঐ

ঘটির মধ্যে ছুরির ফলাটি বিঁধিয়ে দিয়েই সবশুদ্ধ ঘটিটি ওপরে তুলে ধরে। তোমরাও এই খেলা দেখাতে পার, যদি এক ঘটি চাল ও একটি পাঁউরুটি কাটা ছুরি সংগ্রহ করতে পার। কিন্তু দেখে নিতে হবে যে, ঘটির মুখটি যেন ঘটির চেয়ে কিছু ছোট হয়। প্রথমত ঘটির ভেতর চাল ঢেলে কানায় কানায় ভরে ফেলতে হবে। তারপর ছুরি নিয়ে আট-দশ-বার, পাত্রের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি মাত্র গভীর খোঁচা দিতে হবে। এতে হবে কি চালগুলি ঘটির মধ্যে খুব কাছাকাছি জড় হয়ে যাবে। এবার যদি ঐ ছুরি শক্ত করে ধরে পাত্রের প্রায় তলা অবধি বিঁধিয়ে দেওয়া যায় তা'হলে চালগুলি তার গায় এমনভাবে আঁকড়ে ধরবে যে তখন ছুরি ওপরে তুললে সেইসঙ্গে চালশুদ্ধ ঘটিটিও উঠে আসবে।
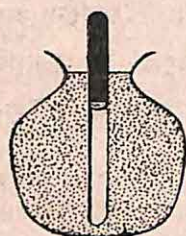
## দড়ির হাতকড়ি

প্রথমে দুই বন্ধুর দুই হাত সুতলি দিয়ে হাতকড়ির মতো করে বেঁধে দিতে হবে, একজনের সুতলি অন্যজনের সুতলির মধ্যে গলানো থাকবে যেমন ছবিতে আছে। এরপর তৃতীয় এক বন্ধুকে বলবে এই
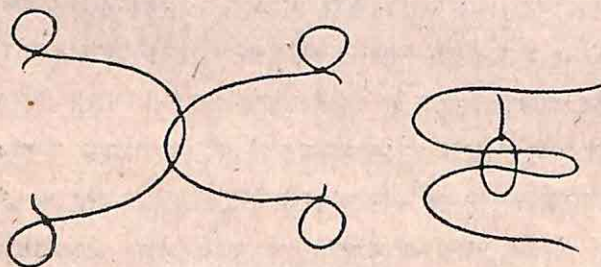
দুইজনকে আলাদা করে দিতে, কিন্তু কোনো মতেই সুতলি কাটা বা গাঁট খোলা চলবে না। এই ধাঁধার সমাধান এইভাবে হতে পারে। একজনের সুতার মাঝখানটা নিয়ে অন্যজনের কজির বাঁধনের নীচে দিয়ে গিয়ে তার হাতের ওপর দিয়ে গলিয়ে আবার ঐ সুতার বাঁধনের তলা দিয়ে বার করে নিতে হবে, তা'হলেই দুজনেই মুক্তি পাবে।

## মুখ থেকে আগুন বার করা

এই খেলা বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে করা প্রয়োজন, তা' না হলে মুখ পুড়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা আছে। প্রথমে একগাছি মোটা সুতা নিয়ে দশ-বারো ঘণ্টা ধরে পোটাসিয়াম নাইট্রেট বা সোরার জলে ( solution ) ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেটা তুলে নিয়ে, শুকিয়ে যাবার পর কাঁচি দিয়ে টুকরা টুকরা করে কাটতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক টুকরা যেন এক ইঞ্চির প্রায় সমান লম্বা হয়। এবার এর মধ্য থেকে একটা টুকরা নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে সাবধানে সেটা মোটা চটের ছোট্ট এক পুঁটলির মধ্যে রাখতে হবে। এখন এই জিনিসটি অনায়াসে মুখের মধ্যে রেখে নিজের ইচ্ছামতো ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি বার করা যেতে পারে। শুধু করতে হবে কি, মুখের ভেতর জ্বলন্ত সুতাশুদ্ধ চটের গুটির ওপর জোরে জোরে কয়েকবার ফুঁ দিতে হবে। যদি তাপমাত্রা বেশি মনে হয়, তা'হলে তখন মুখ একেবারে বন্ধ করে কেবল নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত কোনো অবস্থাতেই কখনও মুখ দিয়ে ভেতর দিকে নিঃশ্বাস নেওয়া চলবে না। এই বৈজ্ঞানিক জাদু দেখাবার সময় প্রতি মুহূর্তেই বিশেষ সাবধান থাকতে হবে। চটের গুটি মুখের লালায় সিক্ত থাকে বলে তাতে আগুন ধরবার সম্ভাবনা থাকে না।

## দুই রঙের ফুল

আর এক রকমভাবে ফুলের রঙ বদলানো যায়। কোনো একটি সাদা ফুল নিয়ে তার ডাঁটি এক গেলাস লাল কিংবা সবুজ রঙে কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে কৈশিক আকর্ষণের ফলে ঐ রঙীন জল ক্রমশঃ ডাঁটি বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে সাদা পাপড়িগুলি রঙীন করে দেয়। যদি ঐ সাদা ফুলের ডাঁটি লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলে একভাগ
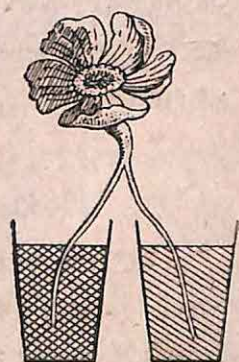
লাল রঙের জলে ও অন্য অর্ধেক ভাগ সবুজ রঙের জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা যায়, তা'হলে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে পুষ্পদলের অর্ধেক অংশ লাল ও অপর অর্ধেক ভাগ সবুজ হয়ে গেছে।

## সচল দেশলাইয়ের কাঠি

এই খেলাটি খুবই বিস্ময়কর। একটি দেশলাইয়ের কাঠি আড়ালে নিয়ে গিয়ে তার অর্ধেকটা খুব ভাল করে শুখনা সাবান দিয়ে ঘষে দিতে হবে। তারপর এই 'মন্ত্রপূত' কাঠি নিয়ে এক গামলা জলের মধ্যে ছেড়ে দিলে সেটি আপনা হতেই আস্তে আস্তে চলতে শুরু করবে, মনে হবে যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

প্রকৃত কথা কাঠির গায়ে ঘষা সাবান জলের মধ্যে গলে গিয়ে অসম তলটানের সৃষ্টি করে আর তার ফলেই তখন কাঠিটা ধীরে ধীরে
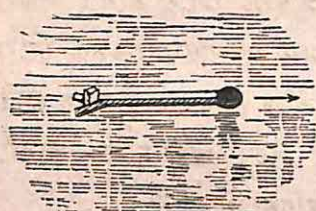
চলে বেড়ায়। সাবানের বদলে কাঠির পিছন দিকটা চিরে নিয়ে তার মধ্যে এক টুকরা কর্পূর লাগিয়ে জলের ওপর ছেড়ে দিলেও সেটা চলতে থাকবে। কর্পূরের ছোট ছোট ডেলা জলে ফেললে সেগুলি কেমন সজীব বস্তুর মতো ঘুরে বেড়ায় তা' অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছ। এটা হয় কর্পূরের বিভিন্ন দিক জলের ভেতর অসমানভাবে গলবার জন্য।

## ক্লিপের কৌতুক

এই খেলাটি খুব সহজ আর মজার। এর জন্য চাই শুধু দুটি তারের ক্লিপ এবং একখানি শক্ত কাগজ। সর্বপ্রথম কাগজখানি নিয়ে ইংরেজী S অক্ষরের মতো করে মুড়ে নেবে, তারপর যে দুই জায়গায় তীরচিহ্ন আঁকা আছে, কাগজের সেই দুই স্থানে কেবল ক্লিপ আটকে

দিতে হবে। এরপর কাগজের দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে সজোরে টান দিলেই আলাদা আলাদা ক্লিপ দুটি হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠে রহস্য-

জনকভাবে শেকলের মতো একটি আর একটির মধ্যে আটকে গিয়ে কিছুদূরে মাটিতে পড়বে।

## ছাঁকনিতে জল রাখা

রূপকথার গল্প নয়, সত্য সত্যই ছাঁকনিতে জল রাখা যায়, যদি তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ঠিকমতো কারুর জানা থাকে।

প্রথমে এমন একটা তারের ছাঁকনি নিতে হবে যার ছেঁদাগুলি যেন এক মিলিমিটারের কম চওড়া না হয়। তারপর একটা কড়াতে মোম গলিয়ে নিয়ে তার মধ্যে ঐ ছাঁকনি একবার ডুবিয়েই তুলে নিতে হবে। এর ফলে ছাঁকনি যে তারের জালে তৈরি, তার গায়ে মোমের একটা সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে যাবে। কিন্তু ছাঁকনি ঠিক ছাঁকনিই থাকবে, ওর মধ্যদিয়ে কোনো স্থচ ঢুকিয়ে দিলেও ঠিক চলে যাবে।

এরপর ঐ ছাঁকনির ভেতর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে জল ঢালতে হবে, কিন্তু এই সময় ছাঁকনি যেন একটুও না নড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার ছাঁকনি থেকে তখন এক ফোঁটাও জল পড়বে না। এমন কি

ঐ মোমমাখানো ছাঁকনি জলের ওপর রাখলেও ডুববে না, নৌকার মতো ভাসতে থাকবে।

## পাঁচ আঙুলে মানুষ তোলা

নিতান্ত বলশালী না হলে একজন সাধারণ লোকের পক্ষে পাঁচ আঙুলে ধরে কোনো মানুষকে উপরে ওঠানো সম্ভব নয়। কিন্তু পাঁচজন ব্যক্তি যদি প্রত্যেকে পৃথক্‌ভাবে নিজের নিজের আঙুল ব্যবহার করেন, তা'হলে এ কাজ সহজেই সম্পন্ন হতে পারে।

প্রথমে একজনকে সমস্ত শরীর সোজা ও শক্ত করে দাঁড়াতে হবে। তারপর যথাক্রমে দুইজন তার দুই পায়ের তলায় তাদের দুই আঙুল রাখবে আর বাকী দুজনকে তার বগলের নীচে দুই আঙুল স্থাপন করতে হবে। এরপর পঞ্চম ব্যক্তি তার এক আঙুল চিবুকের তলায় ধরবে। অতঃপর একটি নির্দিষ্ট সঙ্কেত করবামাত্র পাঁচজনেই যদি একসঙ্গে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করেন, তা'হলে ঐ ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যে মাটি থেকে উপরে উঠে যাবে।

## নাড়ী নিয়ন্ত্রণ

ভারতবর্ষে হঠযোগীরা অনেকদিন থেকেই হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে আসছেন। পল ব্রাণ্টন নামক ইংরেজ লেখক মাদ্রাজ প্রদেশে ব্রহ্ম নামে এক হঠযোগীকে নিজের নাড়ী কিছুক্ষণের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করতে দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয়েছিলেন। রাঁচিতেও রুদ্রদেবজী বলে এক রাজপুত যোগী হাতের শোণিত সঞ্চলন বন্ধ করে দেখিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বাঁ হাতের নাড়ী বন্ধ করেন, তারপর ডান হাতের নাড়ী থামিয়ে দেন, এরপর উভয় হাতের ধমনীর গতি নিরোধ করেন।

সাধারণ লোকের পক্ষে অবশ্য হঠযোগের এই সব কঠিন প্রক্রিয়া আয়ত্ত করা সহজ নয়। তবে এখানে নাড়ী বন্ধ করবার একটা সরল পদ্ধতি বলছি। প্রথমতঃ খেলা দেখাবার আগে দুই বগলের নীচে দুটি

রবারের ছোট্ট বল কিংবা কাপড়ের পুঁটলি লুকিয়ে রাখতে হবে। তার উপর সামান্য ছাপ দিলেই হাতের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে নাড়ী থেমে যাবে, আবার বাহু একটু শিথিল করলেই কব্জীতে পুনরায় রক্ত সঞ্চলন হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। এই ব্যাপার ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে পনের মিনিটের বেশি এইভাবে কখনও নাড়ী বন্ধ করা উচিত হবে না।

## কলার কৌশল

একটা কলার খোসা না ছাড়িয়ে তাকে পরিষ্কারভাবে দুভাগ করা যায় কি না—এই অদ্ভুত সমস্যার সমাধান এইভাবে করা যেতে পারে —প্রথমে একটি ছুঁচ সুতা নিয়ে এক দিক থেকে ঠিক কলার শাঁস
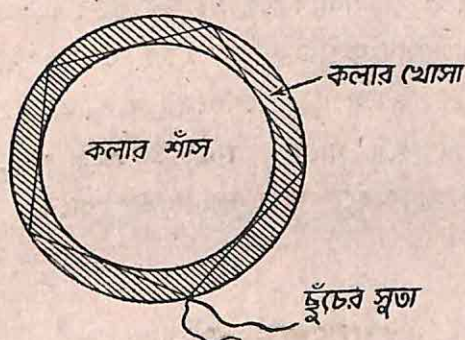
ও খোসার মাঝখান দিয়ে গিয়ে জ্যামিতির স্পর্শরেখা বা tangent-এর মতো আর এক দিক দিয়ে বার করতে হবে। ছুঁচটি যে গর্ত দিয়ে বেরিয়েছে আবার সেই ফুটায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই প্রক্রিয়া বারবার করতে হবে যতক্ষণ না সমস্ত সুতাগাছটি কলার খোসার ঠিক নীচে সমস্ত শাঁসের গায়ের চারিদিকে গোল হয়ে জড়িয়ে যায়। সবশেষে প্রথম ফুটার মুখ দিয়ে সুতার শেষপ্রান্ত বার করতে হবে। এইবার ঐ সুতার দুই প্রান্ত একসঙ্গে করে টান দিলে কলাটি দুখণ্ড হয়ে যাবে কিন্তু খোসা কাটবে না।

## কাগজের খেলা

এই খেলাটি বেশ মজার আর আশ্চর্যজনক। এরজন্য চাই একখানা খবরের কাগজ, এক শিশি গঁদ আর একটি কাঁচি। প্রথমে ঐ খবরের কাগজ থেকে দুই-তিন ফিট লম্বা ও প্রায় দুই ইঞ্চি চওড়া তিনটি ফালি সমান করে কাঁচি দিয়ে কেটে নেবে। তারপর এই রকম একটা ফালি নিয়ে তার দুটি প্রান্ত গঁদ দিয়ে জুড়ে নাও। কাগজের দ্বিতীয় ফালি নিয়ে তারা একপ্রান্ত আধ পাক ঘুরিয়ে অন্য প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে দাও। এরপর তৃতীয় ফালির একপ্রান্ত পুরা এক পাক ঘুরিয়ে অন্য প্রান্তের সঙ্গে পূর্বের মতো যোগ করে দাও।

এবার কাগজের প্রথম ফালি নিয়ে ঠিক লম্বালম্বি আধখানা করে কেটে নাও। তাহলে দুটি পাতলা ফাঁস হবে। দ্বিতীয় ফালিটি ঐ রকমভাবে লম্বালম্বি আধখানা করলে এর ঠিক দ্বিগুণ বড় একটা সরু ফাঁস হয়ে যাবে। আর তৃতীয় ফালিটা একই ভাবে লম্বালম্বি কাঁচি চালিয়ে দু টুকরা করলে ঠিক শেকলের মতো একটির মধ্যে আর একটি—দুটি ফাঁস হয়ে যাবে। যদিও এটা করা খুব সোজা তবুও এতে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে এবং আনন্দ পাবে।

## কাগজের কৌশল

যদি বলি একটা তাসের মধ্য দিয়ে একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে, তা'হলে সকলেই এক বাক্যে বলবে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একখানি তাস কিংবা ঐ আকারের একটা পোস্ট কার্ড ব্লেড বা ছুরি দিয়ে সাবধানে কাটতে পারলে সত্য সত্যই একজন প্রমাণ মানুষের শরীর তার ভিতর দিয়ে অক্লেশে চলে যেতে পারে।

ছবিতে যেমন আছে ঠিক সেই ভাবে তাসের মত বড় একটুকরা কার্ডবোর্ড বা চামড়া ফালি ফালি করে কেটে নাও। তারপর সেটা

একটু টানলেই মালার মতো বড় হয়ে যাবে আর তখন তার ভিতর

দিয়ে একজন সাধারণ মানুষের দেহ সহজেই পার হয়ে যাবে।

## হাইড্রোজেন বেলুন

মানুষের আকাশে ওঠবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্স দেশে মোগলফিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম আকাশে বেলুন ওড়ান। তাঁরা বেলুনে গরম ধোঁয়া ভরে শূন্যে প্রেরণ করতেন। তারপর ঐ বছরই অধ্যাপক চার্লস ধোঁয়ার বদলে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা বেলুন আকাশে ছাড়েন। হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা বস্তু, সাধারণ বাতাসও এর চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ ভারী। এই গ্যাস অত্যন্ত দাহ্য। দুইভাগ হাইড্রোজেন একভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে সম্মিলিত হলে জল হয়। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক লাভয়সিয়র এই গ্যাসের নাম হাইড্রোজেন দেন, অবশ্য তার বিশ বছর আগেই ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিশ এই বায়বীয় পদার্থটি আবিষ্কার করেছিলেন।

এখন বাড়িতে বসে কিরকম করে খুব সহজে হাইড্রোজেন তৈরি করা যায় এবার তাই বলছি। প্রথমে একটি সরু মুখের বোতল সংগ্রহ করে আনতে হবে। তাতে আধ ছটাক আন্দাজ সোডা আর আধ ছটাক চুন দেবে। তারপর শিশির মধ্যে আন্দাজমতো একটু জল আর কিছু টুকরা টুকরা সিগারেটের রাঙ্‌তার কুচি ফেলে দেবে। এরপর শিশিটা জোরে জোরে কয়েকবার নেড়ে নিয়ে ওর মুখে একটা রবারের বেলুন লাগিয়ে দেবে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুনটা যখন সম্পূর্ণ ফুলে উঠবে, তখন তার মুখ সুতো দিয়ে শক্ত করে বেঁধে শূন্যে ছেড়ে দিলেই সেটি আস্তে আস্তে ক্রমশঃ ওপরে উঠতে থাকবে। এই পরীক্ষার প্রাধান উপকরণ চুন ও সোডা দুই যেন তাজা হয়। রঙের বদলে দস্তা কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত ব্যবহার করা যায়।
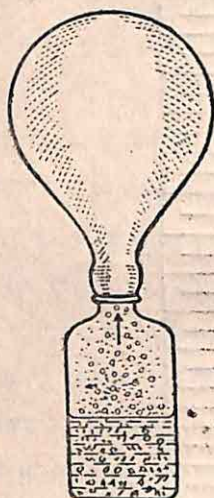
## জাদু চতুষ্কোণ

চারখানি চৌকো কার্ডের উপর লেখা কয়েক সারি সংখ্যার সাহায্যে এই খেলাটি দেখানো হয়ে থাকে। ঠিকমতো তৈরি করতে ও দেখাতে পারলে এই অঙ্কের ম্যাজিকটি বড়ই সুন্দর ও আশ্চর্যজনক বলে মনে হবে।

প্রথমে গ্রাফ কাগজ থেকে ৩" ইঞ্চি লম্বা ও ৩" চাওড়া পাঁচখানি চতুষ্কোণ ভালভাবে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। তারপর ছবিতে যেমন আছে ঠিক সেইরকম করে ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি নির্দিষ্টস্থানে নির্ভুলভাবে লিখে নিতে হবে, আর ফাঁকা X চিহ্নিত সব জায়গা ব্লেড দিয়ে পরিষ্কার করে কেটে দিতে হবে। প্রত্যেক কার্ডের উপরে বা নীচে হাঁ (yes) বা না (no) যেমন আছে ঠিক সেইরকম-ভাবে লিখতে হবে।

এবার কাউকে ডেকে এনে এক থেকে ১৫র মধ্যে কোনো সংখ্যা মনে মনে ভাবতে বলবে। এরপর তাকে প্রথম কার্ডখানি দেখিয়ে

জিজ্ঞাসা করবে তার মনেকরা সংখ্যা এর মধ্যে আছে কি না। সে 'হাঁ' বললে কার্ডের yes লেখা দিক উপরে রাখবে আর 'না' বললে no লেখা দিক উপরে করে ধরবে। এইভাবে পরপর চারখানি চতুষ্কোণ তাকে জিজ্ঞাসা করে ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী সাজাবে।

তারপরই একসঙ্গে সবগুলি কার্ড উল্টে ধরে পিছন দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার নির্বাচন করা সংখ্যা একটি ছোট্ট খোপের মধ্য থেকে রহস্যজনকভাবে উঁকি মারছে। এই মজার খেলাটিকে জাদু জানালা বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।

## উচ্চতা মাপা

মনে কর এমন এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছ যেখানে কোনো ছোট পাহাড় কিংবা উঁচু গাছ অথবা একখানি বড় বাড়ি রয়েছে যার উচ্চতা জানা বিশেষ প্রয়োজন, তাহলে নীচেকার প্রণালী অনুযায়ী অঙ্ক কষে দেখলে নিশ্চয়ই নির্ভুল পরিমাপ পাওয়া যাবে।

আগে সবচেয়ে সোজা উপায় ছায়া ধরে উচ্চতা মাপার কথা বলছি। প্রথমে দু হাত লম্বা একটা কাঠি নিয়ে খাড়া করে ধরে দেখবে রৌদ্রে তার যে ছায়া পড়ছে তা কতখানি লম্বা। মনে কর এই ছায়া চার হাত লম্বা। তারপর গাছের বা বাড়ির ছায়া মেপে দেখবে সেটা ক' হাত হয়। মনে কর গাছের ছায়া হ'ল ৩০ হাত, তা'হলে গাছের উচ্চতা হবে $\frac{৩০}{২}$ হাত অর্থাৎ ১৫ হাত।

অঙ্কটা এই রকম—

$$\frac{\text{কাঠির দৈর্ঘ্য}}{\text{ছায়ার দৈর্ঘ্য}} = \frac{\text{বাড়ির উচ্চতা}}{\text{ছায়ার দৈর্ঘ্য}}$$

$$\therefore \frac{২}{৪} = \frac{\text{বাড়ির উচ্চতা}}{৩০}$$

$$\therefore \text{বাড়ির উচ্চতা} = \frac{২}{৪} \times ৩০ \text{ হাত} = ১৫ \text{ হাত।}$$

এখন উচ্চতা জানবার দ্বিতীয় উপায় বলছি। মেঘলা দিনে ছায়া না পড়লেও এই নিয়মে উচ্চতা মাপা যায়। গাছ থেকে কিছু দূরে একটা পাঁচ ফুট উঁচু কাঠি খাড়া করে মাটির মধ্যে পুঁতবে কিংবা ঐ

জায়গায় তোমার কোনো বন্ধুকে দাঁড়াতে বলবে। তারপর তুমি করবে কি, কাঠি থেকে একটু দূরে মাটির উপর এমন এক জায়গায় চোখ

রাখবে যেখান থেকে কাঠির ডগা বা বন্ধুর মাথা ও গাছের আগা এক লাইনে এসে গেছে। এইবার কাঠি থেকে গাছের দূরত্ব এবং কাঠি থেকে তোমার দূরত্ব মেপে নিতে হবে। তা'হলে অঙ্কটা হল এই ঃ

$$\frac{\text{গাছের উচ্চতা}}{\text{চোখ থেকে গাছের দূরত্ব}} = \frac{\text{কাঠির দৈর্ঘ্য}}{\text{চোখ থেকে কাঠির দূরত্ব}}$$

$$\therefore \text{ গাছের উচ্চতা} = \frac{\text{কাঠির দৈর্ঘ্য} \times \text{চোখ থেকে গাছের দূরত্ব}}{\text{চোখ থেকে কাঠির দূরত্ব}}$$

অর্থাৎ চোখ থেকে গাছের যত দূরত্ব হবে, তাকে কাঠির দৈর্ঘ্য দিয়ে গুণ করে আবার চোখ থেকে কাঠির দূরত্ব দিয়ে ভাগ করতে হবে।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীস দেশে থেলস নামে এক মহাপণ্ডিত বাস করতেন। তিনি উচ্চতা মাপবার একরকম খুব সহজ ও সুন্দর যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, একে dendrometer বা বৃক্ষমাপক বলা হয়।

প্রথমে গ্রাফ কাগজ থেকে ১০ ইঞ্চি লম্বা ও ১০ ইঞ্চি চওড়া একখানি চৌকো কাগজ কেটে নিতে হবে। এতে প্রতি পাশে ১০০টি করে দাগ কাটা থাকে। এই চৌকো কাগজ একটি শক্ত কার্ডবোর্ডে গঁদ দিয়ে ভালো করে জুড়ে দিতে হবে। তারপর ঐ চৌকো কার্ডের উপরের সামনের কোণ থেকে সুতো বেঁধে একটি ছোট্ট ওজন ওলনের

( plumbline ) মতো করে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে, তাহলেই আমাদের যন্ত্র তৈরি হয়ে যাবে।

এখন যদি কোনো গাছের বা স্তম্ভের উচ্চতা মাপবার দরকার হয়, তাহলে যেমন ছবিতে আছে তেমনি করে চৌকো দাগকাটা কার্ডখানি
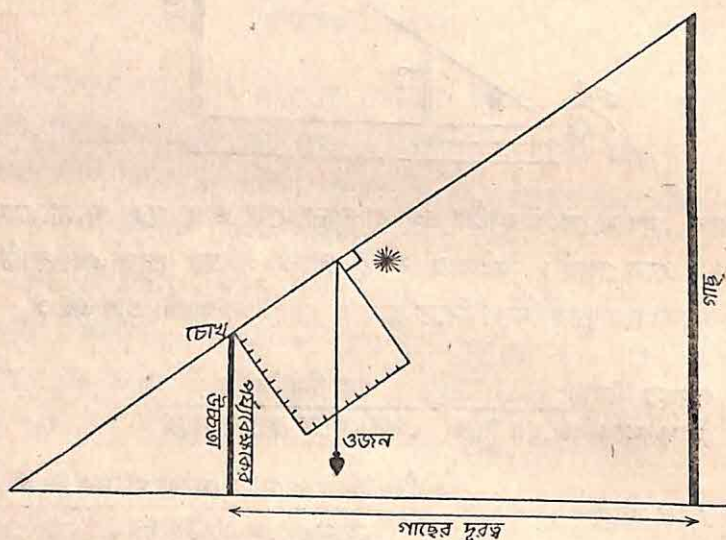
এক চোখের সামনে এমন করে ধরতে হবে যাতে তার উপরের সীমা চোখ ও বৃক্ষশীর্ষের সঙ্গে একই লাইনে এসে যায়। এবার কার্ডের তলা লক্ষ্য করে দেখতে হবে ভারবাঁধা সুতো কোন্ দাগে আছে। অবশ্য পর্যবেক্ষণের জায়গা থেকে গাছের দূরত্ব আগে থাকতেই মেপে রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ গাছের দূরত্ব যদি ২০ ফুট হয় আর বৃক্ষমাপকের সুতো যদি কার্ডের তলায় ৪৫ ঘরে এসে গিয়ে থাকে, তাহলে গাছের উচ্চতা হবে $\frac{৪৫}{১০০} \times ২০ + ৫$ ( পর্যবেক্ষকের উচ্চতা ) ফুট

অথবা ৯ + ৫ ফুট = ১৪ ফুট।

---

* সুতো বাঁধবার সুবিধার জন্য কার্ডের এইঅংশ সামান্য বেরিয়ে থাকবে। ছবির এক দাগ আসল কার্ডের দাগের সমান।

## দিক ঠিক করা

তোমাদের সকলেরই জানা আছে, চুম্বক কম্পাসের সাহায্যে সহজেই সবসময় উত্তর-দক্ষিণ দিক ঠিক করা যায়। দিনের বেলায় সাধারণ ঘড়ির সাহায্যেও দিক ঠিক করবার একটা উপায় আছে, এখন সেই কথা বলছি। ঘড়ির ছোট কাঁটাটি সূর্যের দিকে মুখ করে রাখলে, দক্ষিণ দিক হবে ১২টা ও ছোট কাঁটার ঠিক মাঝখানে। এছাড়া মনে রাখতে হবে, সূর্য সচরাচর সকাল ছটায় পূবদিকে থাকে, বেলা ৯টায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, দুপুর ১২টার সময় দক্ষিণ দিকে, বিকাল ৩টায় দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং সন্ধ্যা ছটার সময় পশ্চিম দিকে অবস্থান করে। অবশ্য ঋতুভেদে ও অক্ষাংশ অনুযায়ী এর কিছু পরিবর্তন ঘটে।
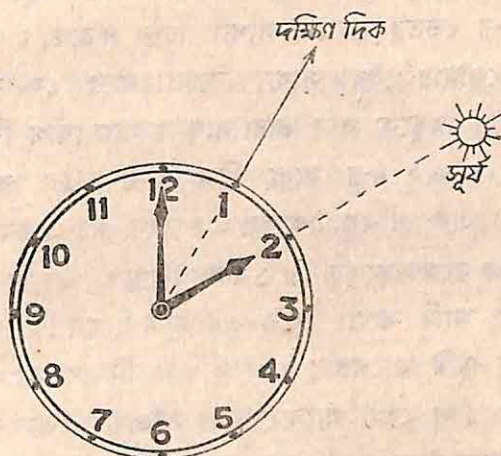
রাত্রিবেলা ধ্রুবতারা দেখে দিক ঠিক করতে হবে। ধ্রুবতারা উত্তর দিকে থাকে। এর একপাশে আছে জিজ্ঞাসা চিহ্নের ( ? ) মতো সপ্তর্ষিমণ্ডল ও অন্যপাশে আছে ইংরেজী 'w' অক্ষরের মতো কাশ্যপীয় নক্ষত্রপুঞ্জ।

সন্ধ্যার সময় আকাশের গায় কালপুরুষ ( orion ) নক্ষত্রমণ্ডল লক্ষ্য করলেও দিক ঠিক করা যায়। কালপুরুষের কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের মতো কয়েকটি ছোট তারার সারি সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিকে

মুখ করে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ রাজনৈতিক উইন্‌স্টন চার্চিল লিখে গেছেন—একবার তিনি আফ্রিকার দুস্তর মরুভূমিতে যখন পথ হারিয়ে ফেলেন তখন কালপুরুষের অবস্থান লক্ষ্য করেই আবার রাস্তা খুঁজে পান। তোমরা সবাই রাত্রির আকাশ দেখে কালপুরুষ ( orion ) নক্ষত্রপুঞ্জকে ঠিক করে চিনে রাখবে।

## অঙ্কের ভবিষ্যদ্বাণী

এই অঙ্কটি খুব মজার, ঠিকভাবে দেখাতে পারলে তোমাদের বন্ধুবান্ধবরা অবাক হয়ে যাবে।

প্রথমে তুমি ১ থেকে ৫০-এর মধ্যে কোনো এক সংখ্যা একটি কাগজে লিখে চাপা দিয়ে রাখো, তারপর কোনো বন্ধুকে বলো ৫০ থেকে ১০০-র ভেতর কোনো সংখ্যা চিন্তা করতো। এবার তুমি ৯৯ থেকে তোমার লেখা সংখ্যা বিয়োগ করে যে সংখ্যা পাবে সেটা তোমার বন্ধুকে তার ভাবা সংখ্যার সঙ্গে যোগ দিতে বলো। এখন সে ১০০ ও ২০০-র মধ্যে তিন অঙ্কের এক রাশি পাবে। তাকে বলো এই রাশির এককের ও দশকের অঙ্ক একেবারে আলাদা করে নিয়ে ওর সঙ্গে শতকের অঙ্ক ১ যোগ দিতে। এরপর তাকে বলো প্রথমে ভাবা আদি সংখ্যা থেকে এই নতুন সংখ্যা বিয়োগ করতে। এইবার যদি তুমি আগেকার সেই কাগজখানি সকলের সামনে বার করে ধর, তাহলে দেখা যাবে তোমার সর্বপ্রথমে লেখা সংখ্যা আর বন্ধুর কষা অঙ্কের উত্তর এক।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে। তুমি একটি কাগজে ২০ লিখে ঢাকা দিয়ে রাখলে। তারপর বন্ধুকে ৫০ ও ১০০-র মধ্যে একটি সংখ্যা ভেবে নিতে অনুরোধ করলে। মনে করো সে ৬৫ ভাবলে। এখন তুমি ওর সঙ্গে ৯৯ − ২০ অর্থাৎ ৭৯ যোগ দিতে বলো। সে ৬৫-র সঙ্গে ৭৯ যোগ দিয়ে ( ৬৫ + ৭৯ ) = ১৪৪ পেল। এবার তাকে এই তিন অঙ্কের ( digit ) রাশি থেকে এককের ও দশকের অঙ্ক আলাদা করে নিয়ে লিখতে বলো। সে ৪৪

লিখল, ওর সঙ্গে শতকের অঙ্ক ১ যোগ দিতে বলো, সে ৪৪ + ১ = ৪৫ পেয়ে গেল। এই যোগফল প্রথমে ভাবা সংখ্যা থেকে বাদ দিতে বলো। সে ৬৫ থেকে ৪৫ বিয়োগ করলেই ২০ পাবে। এই সংখ্যা তুমি অনেক আগেই লিখে রেখেছ।

## সম্ভাবনার অঙ্ক

ভালো করে চিন্তা করে দেখলে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অনেক ব্যাপারে ভবিতব্য বা সম্ভাবনা ( probability ) বলে একটা বিষয়ের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা কতখানি আছে তা' পুরোপুরি না হলেও বেশ খানিকটা অঙ্ক কষে নির্ভুলভাবে আগে থেকেই স্থির করা যায়।

যদি কোনো ভারতীয় মুদ্রা ওপর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সিংহের মুখ উঁচুর দিকে হয়ে পড়বার সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$ বা শতকরা ৫০ ভাগ। কারণ প্রত্যেক ভারতীয় মুদ্রার একদিকে আছে তিন সিংহের ছাপ আর অপর দিকে অন্য চিহ্ন। তেমনি লুডো খেলবার পাশার ছয় পাশে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত ফোঁটা করা আছে। এক্ষেত্রে ৬ পড়বার সম্ভাবনা হবে $\frac{১}{৬}$ বা শতকরা প্রায় ১৬·৬ ভাগ।

৫২খানি তাস ভাল করে মিশিয়ে নেবার পর তার মধ্য থেকে হরতনের সাহেব টানবার সম্ভাবনা হচ্ছে $\frac{১}{৫২}$ বা শতকরা প্রায় ১·৮ ভাগ, কারণ ৫২টি তাসের মধ্যে মাত্র একখানিই আছে হরতনের সাহেব। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে শুধু চিড়িতন টানবার সম্ভাবনা কত, তাহলে উত্তর হবে $\frac{১৩}{৫২} = \frac{১}{৪}$ বা শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র, কারণ ৫২ খানার মধ্যে ১৩ খানি তাস হল গিয়ে চিড়িতন। অবশ্য প্রতিবার তাস টানবার পর, সেই তাস প্যাকে ফেরত দিতে হবে।

এবার এই সম্পর্কে বেশ মজার একটা খেলার কথা বলছি। একখানি বড় সাদা কাগজ নিয়ে ঠিক এক ইঞ্চি দূরে দূরে তাতে অন্ততঃ

দশটি সমান্তরাল রেখা টানবে। তারপর করবে কি এক ইঞ্চির চার-ভাগের তিন ভাগের সমান লম্বা একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে চোখ বুজে প্রায় একফুট উঁচু থেকে ঐ লাইন টানা কাগজের ওপর অনেক-বার ফেলবে। ঐ কাঠিটা হয় ছুটো লাইনের মাঝখানে পড়বে কিংবা কোনো একটি লাইনের ঠিক ওপরেই পড়বে।

এখন আমাদের বিবেচ্য এই কাঠির কোন রেখার ঠিক ওপরে পড়বার সম্ভাবনা কতটুকু। গণিতজ্ঞরা বলেন, এই সম্ভাবনা হচ্ছে

$$\frac{২ \times (\text{ কাঠির দৈর্ঘ্য })}{\frac{২২}{৭} \times (\text{ রেখার দূরত্ব })}$$

$$\text{অর্থাৎ এস্থলে } \frac{২ \times \frac{৩}{৪}}{\frac{২২}{৭} \times ১} = \frac{২১}{৪৪}$$

বা শতকরা প্রায় ৪৭·৭ বার। এখন ধৈর্য ধরে কয়েকশ' বার
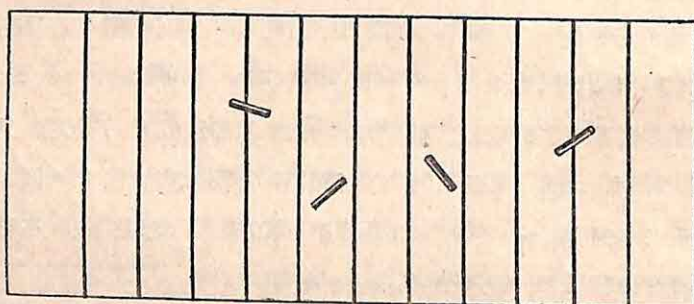
লাইন টানা কাগজের ওপর কাঠি ফেলে পরীক্ষা করলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে দেখবে, অবশেষে ঠিক এই উত্তরই আসছে, যেটা আমরা অনেক আগেই অঙ্ক কষে ঠিক করে রেখেছি।

কাঠির দৈর্ঘ্য আর লাইনের ব্যবধান যে রকম হবে অঙ্কের ফলাফলও তেমনি পৃথক হবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ব্লেজ প্যাস্কাল ( ১৬২৩-১৬৬২ ) এই সম্ভাবনার নিয়ম আবিষ্কার করেন।

যদি কোনো জায়গায় ২৫ জন লোক সমবেত হয়ে থাকে, তাহলে অনায়াসে সেখানে ঘোষণা করা যায় যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে

অন্ততঃ দুজনের জন্মদিন একই হচ্ছে; একথা পরীক্ষা করে দেখলে অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে ঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য জন্মতারিখ ও জন্মমাস এক হলেও জন্মবৎসর পৃথক হতে পারে। আর যদি ৩০ জন লোক জড় হয় তবে কোন দুজনের জন্মদিবস এক হবার সম্ভাবনা হচ্ছে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। চল্লিশ জন থাকলে, এই সম্ভাবনা বেড়ে গিয়ে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ হয়ে যাবে। এটা সম্ভাব্য ঘটনার বড় সুন্দর উদাহরণ।

এবার সম্ভাবনার সাহায্যে একটা খুব মজার তাসের ম্যাজিক কিরকমভাবে দেখানো চলে এখন তাই বলছি। প্রথমে এক গোছা তাস নিয়ে খুব ভালভাবে shuffle করে মিশিয়ে নিতে হবে, তারপর একজনকে বলবে রঙ বাদ দিয়ে যে-কোনো দুটি তাসের নাম বলতে। মনে কর কেউ বললে সাহেব ও বিবি। তারপর করবে কি একটির পর একটি তাস নিয়ে সোজা করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখতে আরম্ভ করবে, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে একটি সাহেব ও একটি বিবি আশ্চর্যজনকভাবে আপনা হতেই পাশাপাশি এসে গেছে। অধিকাংশ স্থলেই এটা সম্ভাবনার নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে থাকে। কিন্তু তুমি দর্শকবৃন্দকে এমনভাব দেখাবে যে, তোমার যাদুকৌশলের ফলেই এটা যেন সঙ্ঘটিত হচ্ছে। কোনো কারণে একবার সফল না হলে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারে সাফল্য করবার পর এই ব্যাপার নিশ্চয়ই হবে।

যদি দুইজন লোক, প্রত্যেকে ৫২খানি তাস নিয়ে পেটাপেটি খেলা আরম্ভ করে দেয়, তাহলে কোনো এক সময় উভয়ের একই সঙ্গে ঠিক একই তাস তোলবার সম্ভাবনা কত? গণিতজ্ঞরা বলেন, এই সম্ভাবনা হচ্ছে $\frac{১৭}{২৭}$ বা প্রায় $\frac{২}{৩}$ ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৬৬ বার।

## আশ্চর্য সংখ্যা

গণিতের রাজ্যে দেখা যায় কতকগুলি সংখ্যার আশ্চর্য গুণ আছে। যেমন, ৫২৬,৩১৫,৭৮৯,৪৭৩,৬৮৪,২১০ আঠার অঙ্কের এই বিরাট সংখ্যাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত যে-কোনো সংখ্যা দিয়েই গুণ করা যাক না কেন পূর্বের অঙ্কগুলি ঠিক পরপর গোল হয়ে ফিরে আসবে ; একে ৭ দিয়ে গুণ করলে ৩৬৮৪২১০,৫২৬৩১৫৭৮৯৪৭০ হয় ; আর ২ দিয়ে গুণ করলে ১০,৫২৬৩১৫৭৮৯৪৭৩৬৮৪২০ হবে।
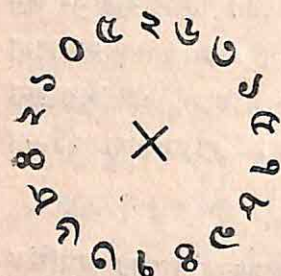
এই রকমই আর একটি বিস্ময়কর সংখ্যা হচ্ছে ১৪২৮৫৭।

১ × ১৪২৮৫৭ = ১ ৪ ২ ৮ ৫ ৭ = ২৭

২ × ১৪২৮৫৭ = ২ ৮ ৫ ৭ ১ ৪ = ২৭

৩ × ১৪২৮৫৭ = ৪ ২ ৮ ৫ ৭ ১ = ২৭

৪ × ১৪২৮৫৭ = ৫ ৭ ১ ৪ ২ ৮ = ২৭

৫ × ১৪২৮৫৭ = ৭ ১ ৪ ২ ৮ ৫ = ২৭

৬ × ১৪২৮৫৭ = ৮ ৫ ৭ ১ ৪ ২ = ২৭

২৭ ২৭ ২৭ ২৭ ২৭ ২৭

এবার এই গুণফলের অঙ্কগুলি ওপর থেকে নীচে কিংবা এক পাশ থেকে অন্য পাশ পর্যন্ত যোগ করলেও সব সময় ২৭ হয়।

অপর আর একটি অদ্ভুত সংখ্যা হলো ১২৩৪৫৬৭৯

১ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ১১১১১১১১১

২ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ২২২২২২২২২

৩ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৩৩৩৩৩৩৩৩৩

৪ × ৯ × ১২৩৪৫৬০৯ = ৪৪৪৪৪৪৪৪৪

৫ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৫৫৫৫৫৫৫৫৫

৬ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৬৬৬৬৬৬৬৬৬

৭ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৭৭৭৭৭৭৭৭৭

৮ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৮৮৮৮৮৮৮৮৮

৯ × ৯ × ১২৩৪৫৬৭৯ = ৯৯৯৯৯৯৯৯৯

## নতুন নিয়মে গুণ

মনে কর কেউ ২-এর বেশি নামতা জানে না, কিন্তু তাকে সব রকমের গুণ করতে হবে। কি রকম করে তা সম্ভব হতে পারে? নীচে যে প্রণালী দেওয়া হ'ল সেই অনুযায়ী অঙ্ক কষলে ৩ থেকে ৯ পর্যন্ত গুণফলের তালিকা না জানা থাকলেও—সব সময় ঠিক উত্তর আসবে।

প্রথমে গুণ্য ও গুণককে পাশাপাশি এক সারিতে স্থাপন করতে হবে। বাঁদিকের সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল ঠিক তার তলায় লিখতে হবে, ভাগশেষ থাকলে সেটা বাদ দেওয়া চলে। আর ডানদিকের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করে তার তলাতেই ফলাফল লিখে যাবে। এবার দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলিকেও এইভাবে যথাক্রমে অর্ধেক ও দ্বিগুণ করে পরপর নীচে নীচে লিখতে হবে। এইরকম ভাবে অগ্রসর হতে হবে, যতক্ষণ না বাঁ সারিতে ভাগফল হিসাবে ১ অবশিষ্ট থাকে। তারপর বাঁ সারিতে কোনো যুগ্মরাশি থাকলে, তাকেও ঠিক তার পাশের ডান সারির সংখ্যাকে কেটে একেবারে বাদ দিয়ে দিতে হবে। এখন যদি ডান সারির সব সংখ্যাগুলি যোগ দেওয়া যায়, তাহলে নির্ভুল গুণফল আসবে। গুণ করবার এই নিয়মটি বেশ নতুন রকমের নয় কি?

উদাহরণ—৫৫ × ৪৪

| | |
|---|---|
| ৫৫ | ৪৪ |
| ২৭ | ৮৮ |
| ১৩ | ১৭৬ |
| ৬ | ৭০৪ |
| ৩ | ৭০৪ |
| ১ | ১৪০৮ |
| | ২৪২০ |

এখন গুণ করবার যে প্রক্রিয়ার কথা বলব সেটা অনেক কাল আগে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিদুষী লীলাবতীর নাম অনুসারে একে লীলাবতীর পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে। এই নিয়মের সাহায্যে খুব বড় বড় গুণ খুব সহজে সম্পন্ন করা যায়। মনে কর ১২৩কে ৪৫৬ দিয়ে গুণ করতে হবে। প্রথমে করবে কি ছ'টি ঘরশুদ্ধ একটি ছক কেটে নেবে। মনে রাখতে হবে গুণ্য ও গুণকে যতগুলি সংখ্যা থাকবে ঠিক ততগুলি ঘর দুই পাশে করে নিতে হবে। তারপর একেবারে ওপরে ১২৩ লিখে ডান দিকে ৪৫৬ লিখে নিতে হবে যেমন ছবিতে আছে। ১২৩ × ৪৫৬

এরপর ৩কে ৪ দিয়ে গুণ করে ১২ লিখতে হবে ডানদিকের সবচেয়ে ওপরের ঘরে, ২ থাকবে অর্ধেক ভাগে আর ১ থাকবে বাকী অংশে। এইরূপে ৪ দিয়ে ২ ও ১কে গুণ করে গুণফল যথাক্রমে ৮ ও ৪ লিখে যেতে হবে। এরপর ৫ দিয়ে ৩কে গুণ করে দ্বিতীয় লাইনের প্রথম ঘরে আধাআধি ভাবে ১৫ লিখতে হবে। এই রকম ভাবে ৫কে ২ ও ১ দিয়ে গুণ করে গুণফল ১০ ও ৫ নির্দিষ্ট অপর দুই খোপে লিখে রাখতে হবে। শেষ সারিতে ৬ দিয়ে ৩, ২, ১কে যথাক্রমে গুণ করে নির্ধারিত তিনটি ঘরে গুণফল ১৮ এবং ১২ ও ৬ লিখবে।

অবশেষে ডানদিকে নীচে থেকে ওপরে কোণাকুণি যোগ করে যোগফল পরপর লিখবে। যেমন, এককের ঘরে শুধু ৮ হলো। তারপর ৫ + ১ + ২ = ৮ দশকের ঘরে। এরপর ২ + ১ + ০ + ১ + ৬ = ১০, শতকের ঘরে ০ লিখে হাতের ১ + ৫ + ১ + ৮ + ১ = ১৬, সহস্রের ঘরে ৬ লিখে হাতের ১ + ৪ = ৫ অযুতের ঘরে রাখতে হবে। তাহলেই গুণ শেষ হয়ে যাবে।

## দোলকের সাহায্যে মনের কথা বলা

প্রথমে একটি আঙটি নিয়ে তার সঙ্গে প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা একটা সুতো বেঁধে দাও। তারপর কোনো দর্শকের হাতে এই সুতো বাঁধা আঙটি দিয়ে তাকে মনে মনে কোনো সংখ্যা চিন্তা করতে অনুরোধ কর।

এরপর তাকে জোর দিয়ে কয়েকবার বল যে, সে যদি কোনো জোড় সংখ্যা ভেবে থাকে তাহলে হাতে ঝোলানো সুতাবাঁধা আঙটি বৃত্তাকারে গোল হয়ে ঘুরতে থাকবে আর যদি সে বিজোড় সংখ্যা মনে করে থাকে, তবে সূত্রসংলগ্ন আঙটি সোজাসুজি একদিক থেকে অন্যদিকে এক লাইনে দুলতে থাকবে।

দর্শককে আরও বলবে, সে যেন ইচ্ছা করে ঐ সুতো না নড়ায় অথবা জোর করে দোলকের গতি বন্ধ করবার চেষ্টা না করে। কিছুক্ষণ পরে সত্যসত্যই দেখা যাবে দর্শকের ভাবা যুগ্ম কিংবা অযুগ্ম সংখ্যা অনুযায়ী দোলক যথাক্রমে বৃত্তাকারে কিংবা সরলরেখায় দুলতে আরম্ভ করেছে। কোনো চিনেমাটির প্লেটের ওপর সুতা ধরে পরীক্ষা করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

এটা কেন হয় এবার তা বলছি। দর্শককে পূর্ব থেকে যে নির্দেশ ( suggestion ) দেওয়া হয়েছিল—দোলক জোড়সংখ্যা চিন্তা করলে গোল হয়ে ঘুরবে আর বিজোড় সংখ্যা মনে করলে সরলরেখায় নড়াচড়া করবে—এই কথা তার মনের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ; সেজন্য তার অবচেতন মন হাতের মাংসপেশীর মাধ্যমে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সুতোবাঁধা দোলকের গতি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই ব্যাপারকে খুব মৃদু সম্মোহনশক্তি ( hypnotism ) প্রয়োগের একটা ভালো উদাহরণ বলা যেতে পারে।

## অঙ্কের দ্বারা চিন্তা-পাঠ

এই তাসের খেলাটি খুবই বিস্ময়কর ও কৌতুকজনক, কিন্তু এর সাফল্যের জন্য ভাল রকম স্মৃতিশক্তি ও মানসাঙ্কে দক্ষতা থাকা প্রয়োজন এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের দরকার।

একজন দর্শককে বলবে, ভাল রকম সাফ্ল করে তাসের গোছা থেকে খানিকটা তাস নিয়ে নিতে। তুমি একবারমাত্র ঐ তাসগুলি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি সমস্ত তাসের ওপর চোখ বুলিয়ে নেবে। তারপর ঘোষণা করবে তোমার স্মরণশক্তি এতোই প্রখর যে, এরই মধ্যে সবগুলি তাসের মান মুখস্থ হয়ে গেছে। এবার দর্শক তোমার অসাক্ষাতে ঐ প্যাকেট থেকে একখানি তাস বেছে নিয়ে বাকী তাস তোমায় ফেরত দিয়ে দেবে। তুমি আবার একবার সব তাসের ওপর চোখ চালিয়ে নিয়েই পছন্দকরা তাসের নাম সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবে। এতে দর্শক খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবে।

এখন এর গুপ্ত কৌশল ব্যক্ত করছি। প্রথমবার যখন তুমি তাসের গোছা হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি তাস দেখতে আরম্ভ করবে, তখন সেইসঙ্গে তাদের বিশেষত্ব নির্দেশক সংখ্যা যোগ করতে থাকবে। গোলামকে ১১, বিবিকে ১২ ধরবে আর সাহেবকে সম্পূর্ণ বাদ দেবে। যোগফল ১৩ কিংবা তার বেশি হয়ে গেলেই তা' থেকে ১৩ বিয়োগ করতে থাকবে। এই সঙ্গে তাসের রঙও গুণে চলবে। চিড়িতনকে ১, ইস্কাবনকে ২, আর হরতনকে ৩ ধরবে এবং রুইতনকে একেবারে অগ্রাহ্য করবে। যখনই রঙের সংখ্যার যোগফল ৪ হবে কিংবা তার ওপরে উঠবে তখন তা' থেকে ৪ বিয়োগ করে দেবে। এর ফলে উভয় সংখ্যাই কখনও বেশি বড় হয়ে উঠতে পারবে না। খুব একাগ্র মনে এই দুই রকম সংখ্যার যোগ-বিয়োগ করে যেতে হবে। তবে তাসের পরিমাণ খুব অল্প হলে ১৩ বা ৪ ক্রমান্বয়ে বাদ দিয়ে যাবার দরকার হবে না, সেস্থলে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি একসঙ্গে যোগ দিয়ে গেলেই চলবে। সবশেষে তাসের ফোঁটা ও রঙের সংখ্যার যোগফল ভাল করে মনে করে রাখবে। এরপর দর্শক তোমার মুখস্থ করা তাসের গোছা থেকে একখানি তাস লুকিয়ে টেনে নিয়ে যখন তোমাকে বাকী তাস ফেরত দেবে, তখন তুমি পুনরায় পূর্বের মতো সমস্ত তাসের ফোঁটা ও রঙের সংখ্যা যোগ করে দেখবে। এবার আগেকার মনে রাখা তাসের ও রঙের নির্দেশক সংখ্যার যোগফল

থেকে দ্বিতীয়বারের সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করলেই নির্বাচিত তাসের নাম বেরিয়ে আসবে।

যদি দ্বিতীয়বার তাসের ফোঁটার যোগফল প্রথম যোগফল থেকে বেশি হয়, তাহলে প্রথম তাসের যোগফলের সঙ্গে ১৩ যোগ করে তারপর তাই থেকে দ্বিতীয় যোগফল বিয়োগ করবে। সেই রকম প্রথম বারকরা রঙের সংখ্যার যোগফল কম হলে তাতে ৪ যোগ করে তারপর তা থেকে দ্বিতীয়বারের রঙের সংখ্যার যোগফল বিয়োগ করতে হবে। যদি রঙের সংখ্যার যোগফল দুইবারই এক হয় তাহলে পছন্দকরা তাসটি নিশ্চয়ই রুইতন হবে। আর যদি তাসের ফোঁটার যোগফল দু'বারই একরকম হয়, তাহলে তাসটি অবশ্যই সাহেব।

প্রথমে দশ-বারোখানি তাস নিয়ে এই কৌশল আয়ত্ত করতে হয়, তারপর ক্রমে ক্রমে পঁচিশ-ত্রিশ থেকে বাহান্নখানি তাস নিয়ে এ খেলা দেখানো যায়।

উদাহরণস্বরূপ মনে কর, তাসের গোছার মধ্যে রু—৮, হ—সা, হ—৯, হ—১০, চি—বি, ই—৪, চি—৩, রু—৩, চি—৫, হ—বি— এই দশখানি তাস আছে। এই সব তাসের যোগফল হবে এই রকম—৮ + ৯ = ১৭, ১৭ − ১৩ = ৪, ৪ + ১০ = ১৪, ১৪ − ১৩ = ১, ১ + ১২ = ১৩, ১৩ − ১৩ = ০, ৪ + ৩ + ৩ + ৫ = ১৫, ১৫ − ১৩ = ২, ২ + ১২ = ১৪, ১৪ − ১৩ = ১, এই এক-কে মনে রাখতে হবে। আর রঙের যোগফল হবে এইভাবে—৩ + ৩ = ৬, ৬ − ৪ = ২, ২ + ৩ = ৫, ৫ − ৪ = ১, ১ + ১ + ২ = ৪, ৪ − ৪ = ০, ১ + ১ + ৩ = ৫, ৫ − ৪ = ১, এই এক-কেও মনে করে রাখা চাই। সুতরাং আমাদের স্মরণীয় দুটি সংখ্যা হল ১ ও ১। এখন চিন্তা করা যাক দর্শক একখানি তাস লুকিয়ে রাখল। দ্বিতীয়বার তাসের সংখ্যা যোগ করে ২ বাকী থাকল আর রঙের সংখ্যা যোগ দিয়ে ২ অবশিষ্ট রইল। এখন আমাদের প্রথমবারের পাওয়া ১ ও ১ থেকে যথাক্রমে দ্বিতীয়বারের যোগফল ২ ও ২ বিয়োগ করতে হবে। সুতরাং পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী ১-এর

সঙ্গে ১৩ যোগ করে তা' থেকে ২ বিয়োগ করলে ১২ হয়, অতএব লুকানো তাসখানি হবে বিবি। আর প্রথমবারের রঙের সংখ্যাফল ১-এর সঙ্গে ৪ যোগ করে তা' থেকে ২ বিয়োগ করলে ৩ হয়, সুতরাং অজানা তাসখানি নিশ্চয়ই হরতন হচ্ছে।

মনে মনে কষা এই অঙ্ক যদি ঠিক থাকে, তা হলে প্রতিবারই সাংকেতিক সংখ্যার অর্থ অনুসরণ করে অজ্ঞাত তাসের নাম নির্ভুলভাবে বলা যায়।

## অঙ্কের আশ্চর্য

মানস-অঙ্কের সাহায্যে অনেক সময় খুব মজার মজার অদ্ভুত তাসের ম্যাজিক দেখানো যায়। এখানে এরকম একটা সুন্দর জাদু-কৌশল ব্যক্ত করা গেল, যাতে দর্শকের মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে, তুমি দিব্যদৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। কোনো দর্শককে বলবে, তার পকেট থেকে একটি মুদ্রা নিয়ে তাতে যে সাল উৎকীর্ণ আছে তা' একটি কাগজে লিখে রাখতে। তারপর তাকে বলবে সংখ্যাটি উল্টো করে লিখে, বড় থেকে ছোট সংখ্যা বাদ দিতে। মনে কর মুদ্রার তারিখ ১৯৬৫ সাল, যেটা ওল্টালে হবে ৫৬৯১, এ থেকে ১৯৬৫ বাদ দিলে ( ৫৬৯১ − ১৯৬৫ ) = ৩৭২৬ হয়। এরপর দর্শককে এক গোছা তাস থেকে এই সংখ্যার সঙ্গে ফোঁটা মিলিয়ে চার রঙের চারখানি তাস গোপনে নির্বাচন করতে হবে। কোনো ০ থাকলে সে জায়গায় তাকে একখানি সাহেব নিতে হবে। এক্ষেত্রে সে হরতনের তিরি, রুইতনের সাতা, চিড়িতনের দুরি আর ইস্কাবনের ছক্কা নিতে পারে। এই কাজ নিষ্পন্ন হবার পর তাকে তাসগুলি উপুড় করে টেবিলের ওপর রাখতে বলবে। তারপর তাসগুলি সেই অবস্থায় এমনভাবে এলোমেলো করতে হবে, যাতে করে সে কিংবা তুমি কেউ বলতে পারবে না কোন তাস কোনটি হচ্ছে। এবার এ থেকে একখানি তাস নিয়ে না দেখে এবং না দেখিয়ে দর্শক যেন

তার নিজের পকেটে রেখে দেয়, সেই রকমভাবে তাকে নির্দেশ দেবে।

এখন তুমি করবে কি, বাকী তিনখানি তাস তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে রঙ লক্ষ্য করে, সব ফোঁটার সংখ্যা যোগ দিয়ে ৯-এর নিকটতম গুণনীয়ক ( multiple ) থেকে বিয়োগ করবে ; তাহলেই দর্শকের লুকিয়ে রাখা তাসের নাম বলতে পারবে। মনে কর, টেবিলের ওপরকার অবশিষ্ট তাস হচ্ছে হরতনের তিরি, চিড়িতনের ছুরি। ইস্কাবনের ছক্কা, তাহলে দর্শকের তাসের রঙ নিশ্চয়ই রুইতন। আর ফোঁটাগুলি যোগ দিলে হয় ৩+২+৬=১১ ; এখন ৯-এর নিকটতম গুণনীয়ক ১৮ থেকে ১১ বিয়োগ করলে ৭ থাকে, সুতরাং দর্শকের পছন্দ করা তাস হবে নিশ্চয়ই রুইতনের সাতা। এই সময় দর্শক যদি তার পকেটে রাখা তাস বাইরে এনে পরখ করে, তাহলে তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হতে দেখে নিশ্চয়ই সে খুবই অবাক হয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে সে নিজেও জানত না যে কোন তাস কিছুক্ষণ আগে সে সংগোপনে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল।

## বিদ্যুৎবিহীন ট্র্যানজিসটার রেডিও

বেতারের ছুটি অংশ আছে। প্রথম যেখান থেকে গান ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে। কেউ গান গাইলে অথবা কথা বললে সেই শব্দকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুৎ চৌম্বিক ( electro magnatic ) তরঙ্গে পরিণত করে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া এই অংশের কাজ। এই কাজটি বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র ( radio stations ) করে থাকেন। দ্বিতীয় অংশে বাড়িতে এরিয়ালে এই তরঙ্গ ধরে, তাকে গ্রাহকযন্ত্রের সাহায্যে শব্দে পরিণত করা হয়। তার সেই শব্দই আমরা শুনে থাকি। ইচ্ছে করলে আমরা খুব সহজেই একটি ছোট গ্রাহকযন্ত্র তৈরি করে গান-বাজনা শুনতে পারি। বলা বাহুল্য

এই গ্রাহকযন্ত্রের জন্য কোনোপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হবে না ও এই ট্র্যানজিসটার রেডিওর সার্কিটটি ট্র্যানজিসটারের সবচেয়ে সহজতম সার্কিট। এই সার্কিটে একটিমাত্র কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেটি বাজারে প্রচলিত যে-কোনো স্ট্যাণ্ডার্ড মিডিয়াম ওয়েভ কয়েল। ভেরিয়েবল কনডেনসারটি ·0005 mfd এবং অপর কনডেনসারটি ·002 mfd-এর। এই সেটটিতে আর্থ ও এরিয়াল প্রয়োজন। ট্র্যানজিসটারে কালেকটার, বেস ও এমিটার এই নামবিশিষ্ট তিনটি তার থাকে। যে তারটির নিকটে ট্র্যানজিসটারের গায়ে লাল ফুটকি অথবা ত্রিভুজের মতো চিহ্ন দেওয়া থাকে সেই তারটির নাম কালেকটার, মধ্যের তারটির নাম বেস এবং শেষেরটি এমিটার।
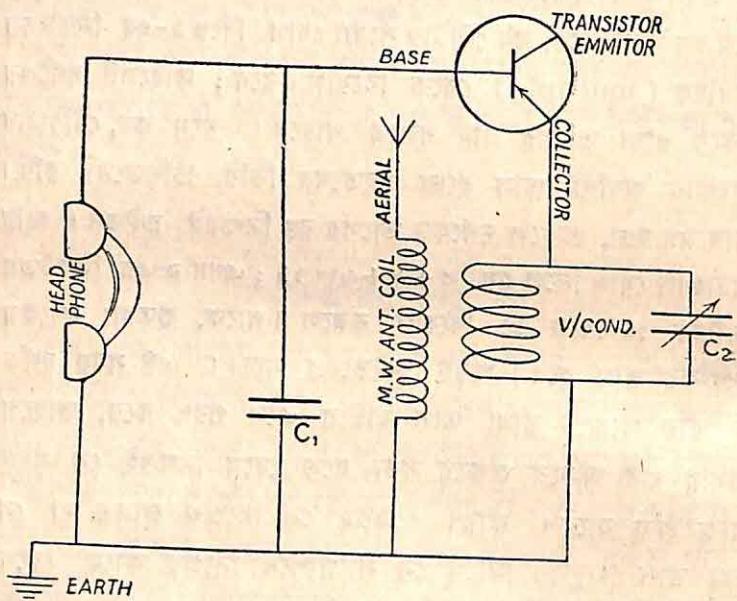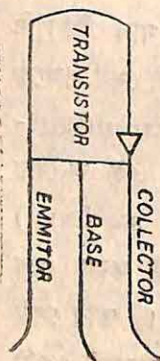
গঠন-পদ্ধতি ঃ ট্র্যানজিসটারের কালেকটারের সঙ্গে কয়েলের একটি তার যোগ করতে হবে। কয়েলের পরের তার আর্থে যোগ করতে হবে। ট্রানজিসটারের কালেকটারে ভেরিয়েবল কনডেনসা-রের এক পয়েন্ট ও ভেরিয়েবল কনডেনসারের অপর পয়েন্ট আর্থে কানেকশন করতে হবে। কয়েলের অপর অংশের দুটি পয়েন্টের একটিতে আর্থ ও অপর দিকে এরিয়ালে কানেকশন হবে। কনডেন-সার $C^1$-এর এক পয়েন্ট ট্র্যানজিসটারের বেস-এ ও অপর পয়েন্ট আর্থে কানেকশান হবে, হেডফোনের একটি তার ট্র্যানজিসটারের বেসে ও অপর পয়েন্ট আর্থে কানেকশান হবে। ট্র্যানজিসটারে এমিটারে কোনো কানেকশান হবে না। আর্থ জলের কলের পাইপে কানেকশান হবে।

পার্টসের ( parts ) সংযুক্ত অংশে ঝালা দিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়।

চেসিসের ওপর ট্যাগস্ট্রিপ ( tagstrip ) ফিক্স করে তার ওপর সমস্ত পার্টস আটকাতে হবে।

সেটটি তৈরি হয়ে যাবার পর আর্থ ও এরিয়াল লাগিয়ে ভেরিয়ে-বল কনডেনসারে নব ( knob ) ঘোরালেই গান-বাজনা শুনতে পাওয়া যাবে, তবে সেই সময় স্থানীয় বেতার-কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান প্রচারিত হলে তবেই গান-বাজনা শোনা যাবে।

প্রয়োজনীয় পার্টসের তালিকা ঃ

1 Pc. Transister 251377 (Hitachi)
1 Pc. Variable condenser ·0005 mfd
I Pc. Ceramic condenser ·0002 mfd
1 Pc. Medium wave antena coil
1 Pc. Head phone 2000 ohms impedance
1 Pc. Chassis (local)
1 Pc. Knob
2 Pcs. Tagstrips 6 Pole
Connecting wire (flexiable or hook up).

## জাদু-বর্গ

ম্যাজিক স্কোয়ার বা জাদু-বর্গ প্রাচীনকাল থেকেই গণিতজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সাধারণ লোকেরও এই সম্পর্কে কৌতূহল বড় কম নয়। অনেকের বিশ্বাস, জাদু-বর্গের অলৌকিক শক্তি আছে। ভারতবর্ষে ধাতু বা পাথরের ওপর জাদু চতুষ্কোণ খোদাই করে মাদুলীর মতো ধারণ করার প্রথা আছে। পূর্বকালে জ্যোতিষীদের ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত ঘর-পূরণের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের যোগাযোগ বর্তমান। সচরাচর সমস্ত জাদু-বর্গের সংখ্যাগুলি ওপর থেকে নীচে, পাশাপাশি কিংবা কোণাকুণি যোগ করলে যোগফল সব সময় একরকম হয়। ইম্যানুয়েল সস্কোপিউলাস নামক একজন গ্রীক গণিতজ্ঞ গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে জাদু-বর্গ সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বীয় মতামত লিপিবদ্ধ করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রস্ট নামীয় এক ইংরেজ ভদ্রলোক নাসিকে অবস্থানকালে এদেশের জাদু-বর্গ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ১৯৫৭ গ্রীস্টাব্দে কেম্ব্রিজ থেকে মুদ্রিত কোনো মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এখন এখানে কয়েক প্রকার চিত্তাকর্ষক জাদু-বর্গের নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫ | ১০ | ৩ | ৬ |
| ৪ | ৫ | ১৬ | ৯ |
| ১৪ | ১১ | ২ | ৭ |
| ১ | ৮ | ১৩ | ১২ |

৩৪

১নং চিত্র

১. সংস্কৃত ভাষায় চার অঙ্কের এই ঘর-পূরণটি গোয়ালিয়র দুর্গের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ছিল। এর যোগফল ৩৪।

২. তিন অঙ্কের এই জাদু-চৌকা মুদীর দোকানে দেওয়ালের

| ৮ | ১ | ৬ |
|---|---|---|
| ৩ | ৫ | ৭ |
| ৪ | ৯ | ২ |

১৫

২নং চিত্র

গায়ে প্রায়ই অঙ্কিত থাকতে দেখা যায়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ইহা সৌভাগ্যসূচক। এর যোগফল ১৫।

| ২৩ | ১ | ২ | ২০ | ১৯ |
|---|---|---|---|---|
| ২২ | ১৬ | ৯ | ১৪ | ৪ |
| ৫ | ১১ | ১৩ | ১৫ | ২১ |
| ৮ | ১২ | ১৭ | ১০ | ১৮ |
| ৭ | ২৫ | ২৪ | ৬ | ৩ |

৬৫ ও ৩৯

৩নং চিত্র

৩. এইবার যে জাদু-বর্গ দেওয়া হবে, তাতে দুই রকম ঘর-

| ৮× | ২৫৬ | ×২ |
|---|---|---|
| ৪× | ১৬ | ×৬৪ |
| ১২৮× | ১ | ×৩২ |

৪০৯৬

৪নং চিত্র

পূরণ আছে। সমগ্র জাদু-বর্গের যোগফল ৬৫ ; তার অন্তর্গত ক্ষুদ্র বর্গের যোগফল ৩৯।

৪. ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত ম্যাজিক স্কোয়ারের গুণফল সবদিক থেকে ৪০৯৬।

264

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | 11 | 89 | 68 |
| 88 | 69 | 91 | 16 |
| 61 | 86 | 18 | 99 |
| 19 | 98 | 66 | 81 |

264

৫নং চিত্র

৫. উপরের জাদু চতুষ্কোণটির সংখ্যাগুলির যোগফল ২৬৪। উল্টে দেখলেও একই ব্যাপার।
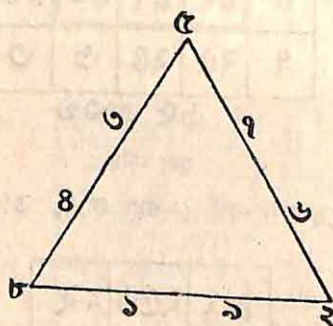
৬নং চিত্র

৬. উপরকার সংখ্যাগুলি ত্রিভুজের আকারে সজ্জিত, প্রতি পাশের সংখ্যাগুলির যোগফল ২০।

৭. নিম্নে একটি যাদু-চক্র দেওয়া হলো। আটটি বৃত্ত নিয়ে গঠিত এই জাদু-চক্রের মাঝখানে আছে ১২। ওর সঙ্গে এই চক্রের ব্যাসার্ধ বা পরিধির সংখ্যাগুলি যোগ দিলে ৩৬০ হয়। কথিত আছে, এর আবিষ্কারক সুপ্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।
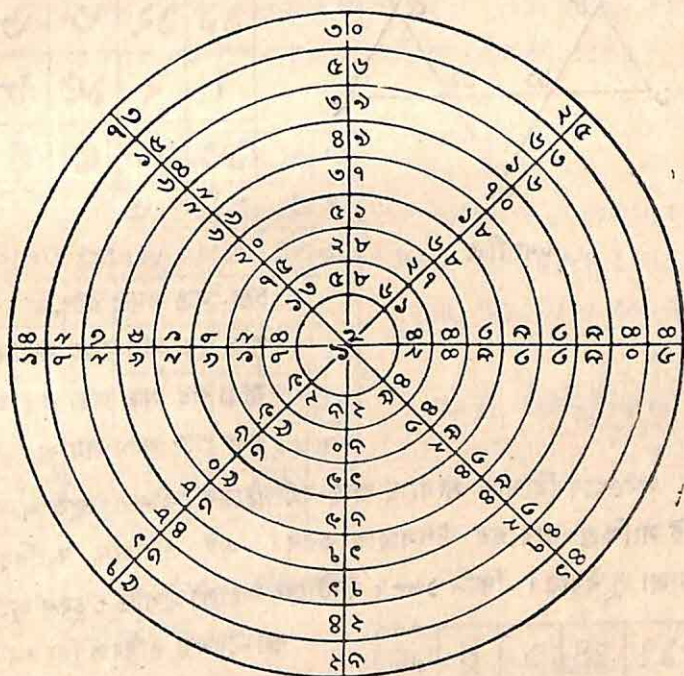
৭নং চিত্র

৮. পরপৃষ্ঠায় একটি জাদু-তারকা দেওয়া হলো। প্রতি সারির সংখ্যাগুলির যোগফল ২৬; আবার শীর্ষস্থ সবগুলি সংখ্যা যোগ দিলেও হয় ২৬।

৯. গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ৩২-এর ম্যাজিক স্কোয়ার দেওয়া আছে। পঞ্জিকাকারের মতে, বত্রিশের ঘর-পূরণের সঙ্গে পরপৃষ্ঠায়

লিখিত ( ৯নং চিত্র ) এই মন্ত্র অশ্বত্থ পত্রে লিখে প্রসূতির কেশের সঙ্গে বেঁধে দিলে কোনোরূপ কষ্ট হয় না।
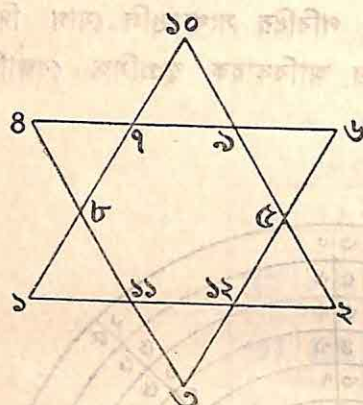
৮নং চিত্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ | ৯ | ১৪ |
| ১১ | ১২ | ৩ | ৬ |
| ৭ | ২ | ১৫ | ৮ |
| ১৩ | ১০ | ৫ | ৪ |

৩২

৯নং চিত্র

চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ,
পৃষ্ঠে নব করি বুঝহ সন্ধান।
যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা,
কুম্ভ পদে ভাগ সমাধা।

সর্বশেষে বিযোড় সংখ্যার জাদু-বর্গ গঠনের কৌশল প্রকাশ করে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উপসংহার করব। এই প্রণালীর আবিষ্কারক ডি লা লুবিয়ার। তিনি ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের শ্যামদেশস্থ রাষ্ট্রদূত ছিলেন এবং সেই দেশে অবস্থানকালে এই নিয়মের বিষয় অবগত হন। প্রথমে ১ সংখ্যাটি উপরের সারির মাঝের ঘরে স্থাপন করা হয়। অতঃপর ২ থেকে আরম্ভ করে অন্য সংখ্যাগুলি যথাক্রমে পরপর কোণাকুণি-ভাবে উপরের দিকে দক্ষিণ পার্শ্বে লেখা হয়ে থাকে। কেবল (১) উপরের

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ | ২৪ | ১ | ৮ | ১৫ |
| ২৩ | ৫ | ৭ | ১৪ | ১৬ |
| ৪ | ৬ | ১৩ | ২০ | ২২ |
| ১০ | ১২ | ১৯ | ২১ | ৩ |
| ১১ | ১৮ | ২৫ | ২ | ৯ |

৬৫

১০নং চিত্র

সারি পৌঁছে গেলে পরের সংখ্যাটি একেবারে তলার লাইনে লেখা হয়, যেন উহা ঠিক উপরের সারির নীচেই আছে। (২) যখন ডানদিকের শেষ স্তম্ভে এসে যায়, তখন পরের সংখ্যাটি বামদিকের স্তম্ভে লিখতে হয়, যেন উহাই দক্ষিণ স্তম্ভের পরে বর্তমান। (৩) যখন দেখা যায়, কোনো ঘর আগেই পূরণ হয়ে গেছে অথবা যখন উপরের দিকে দক্ষিণ সারির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, তখন এই সংখ্যাক্রম ঠিক নীচেকার ঘরে লিখতে আরম্ভ করে আবার উপরের দিকে কোণাকুণি উঠতে হয়। ১০নং নক্সায় প্রদর্শিত ঘর-পূরণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হবে।

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 61 | 4 | 13 | 20 | 29 | 36 | 45 |
| 14 | 3 | 62 | 51 | 46 | 35 | 30 | 19 |
| 53 | 60 | 5 | 12 | 21 | 28 | 37 | 44 |
| 11 | 6 | 59 | 54 | 43 | 38 | 27 | 22 |
| 55 | 58 | 7 | 10 | 23 | 26 | 39 | 42 |
| 9 | 8 | 57 | 56 | 41 | 40 | 25 | 24 |
| 50 | 63 | 2 | 15 | 18 | 31 | 34 | 47 |
| 16 | 1 | 64 | 49 | 48 | 33 | 32 | 17 |

বর্গাকারে যে-কোনো চারটি সংখ্যা যোগ করলে 130 হবে। যেমন, $54+10+43+23 = 130$

অথবা, $50+16+63+1 = 130$

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জাদু-বর্গ
যোগফল 260

621

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 61 | 72 |
| 71 | 62 | 19 | 27 |
| 12 | 21 | 77 | 69 |
| 67 | 79 | 22 | 11 |

179

বিপরীতমুখী জাদু-বর্গ
যোগফল 179
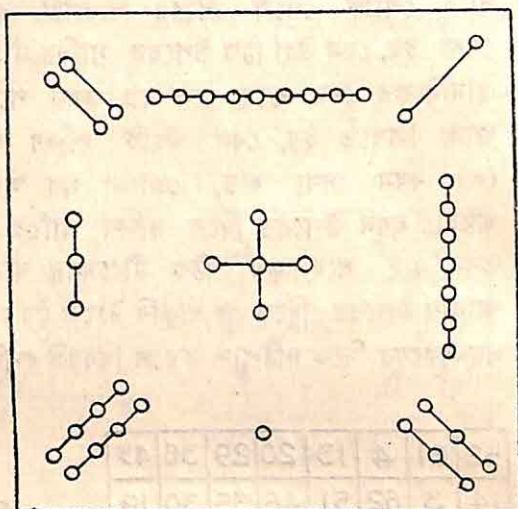
তিন হাজার বছর আগের ১৫'র প্রথম জাদু-বর্গ।

## অঙ্কের জাদু

প্রসিদ্ধ ফরাসী জাদুকর রবার্ট হুডিন ( ১৮০৫-৭১ খ্রীঃ ) থটরিডিং বা চিন্তাপঠনের খেলা দেখাবার কালে অনেক সময় অঙ্কের সাহায্য নিতেন। বিশিষ্ট আমেরিকান জাদুকর 'তাসের রাজা' হাওয়ার্ড থার্সটনও অঙ্কের সহায়তায় অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাতে পারতেন, তাঁর কাছে কোনো তাসের নাম বলামাত্র তিনি তিন সেকেণ্ডের মধ্যে হাতের তাস সেইখানেই কাটিয়ে দিতেন। বাস্তবিক, মানসাঙ্কের সাহায্যে অনেকরকম আশ্চর্যজনক জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করা যায়। এর অন্তর্নিহিত কৌশল যে সূক্ষ্ম সংখ্যা-সংশ্লিষ্ট, তা জানা না থাকলে খুবই বিস্ময় বোধ হয়। আমাদের দেশে সোমেশচন্দ্র বসু মহাশয় ( ১৮৮৭-১৯৫৫ খ্রীঃ ) তাঁর অসামান্য গণনাশক্তির বলে স্বদেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সোমেশচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণকালে একবার একশত সংখ্যাযুক্ত একটি রাশিকে একশত সংখ্যার অপর একটি রাশি দিয়ে মনে মনে গুণ করে ৫২ মিনিটের মধ্যে নির্ভুল উত্তর বলে দিয়েছিলেন। বিখ্যাত বিদ্যুৎ-

বিশারদ অ্যাম্পিয়ার (১৭৭৫-১৮৩৬ খ্রীঃ) ও গস্ উভয়েই অদ্ভুত মানসিক গণনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। অবশ্য এঁরা অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি, সুতরাং এঁদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের পক্ষে এই প্রবন্ধে গণিতের কোনোরকম কঠিন কথা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে কেবল কয়েক প্রকার সহজসাধ্য ও চিত্তাকর্ষক মজার অঙ্ক সংকলিত হয়েছে। অল্প আয়াস ও অভ্যাসের দ্বারা অনেকেই এই সব গাণিতিক ক্রীড়াকৌতুক দেখিয়ে অবসরকালে সকলকে প্রচুর আনন্দদান করতে পারবেন।

নীচে যে সকল অঙ্কের ম্যাজিক দেওয়া হলো, তাতে আপনার অজানা কোনো সংখ্যা নিয়ে যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগ করবার পর আপনি অনায়াসে অঙ্কের শেষফল বলে দিতে পারবেন।

১. কোনো বন্ধুকে যে কোনো একটা সংখ্যা ভাবতে বলুন। তারপর সংখ্যাটিকে ২ দিয়ে গুণ করে ১০ যোগ দিতে বলুন। এবার ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল থেকে প্রথমে মনে করা সংখ্যাটিকে বাদ দিতে বলুন। তারপর বন্ধুকে কোনোরকম প্রশ্ন না করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, সর্বশেষ বিয়োগফল নিশ্চয়ই ৫। আপনার বন্ধু অবাক হয় যাবেন। উদাহরণ ঃ (৩ × ২ + ১০) ÷ ২ − ৩ = ৫।

২. কাকেও তিন সংখ্যার এমন একটি রাশি মনে করতে বলুন, যার প্রথম সংখ্যা ও শেষ সংখ্যার তফাৎ একের বেশি। তারপর তাকে সংখ্যাটিকে উল্টে নতুন রাশি গড়তে বলুন। এবার দুইটি রাশির মধ্যে বড়টি থেকে ছোট রাশিটি বাদ দিতে বলুন। বিয়োগফল উল্টে আবার তাতে যোগ দিতে অনুরোধ করুন। কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করেই আপনি বলে দিতে পারেন—যোগফল নিশ্চয়ই ১০৮৯। উদাহরণ ঃ

৬৫৪
৪৫৬
———
১৯৮
৮৯১
———
১০৮৯

৩. এই অঙ্কের খেলাটি যে-কোনো সংখ্যক গুলি নিয়ে করা যেতে পারে। প্রথমে কোনো ব্যক্তিকে বাঁ হাতে দশের বেশি কয়েকটি গুলি নিতে নির্দেশ দিন। এরপর তাকে ডান হাতে বাঁ'র 'ক' গুণ বেশি গুলি রাখতে অনুরোধ করুন। এবার তাকে বাঁ হাত থেকে 'খ' সংখ্যক গুলি ডান হাতে নিতে বলুন, তবে 'খ' যেন দশের কম হয়। এখন বাঁ হাতে যত গুলি আছে, তার 'ক' গুণ গুলি ডান থেকে বাঁ হাতে নিতে বলুন। তাহলে তার ডান হাতে নিশ্চয়ই খ × (ক + ১) সংখ্যক গুলি অবশিষ্ট থাকবে। এই সংখ্যা আপনার জানা, সুতরাং রহস্যজনকভাবে ইহা ব্যক্ত করলেই সুন্দররূপে এই খেলা শেষ হবে। এখানে যে উদাহরণ দেওয়া আছে তাতে ক = ২ ও খ = ৩ ধরা হইয়াছে।

বন্ধুকে বাঁ হাতে দশের বেশি যতগুলি ইচ্ছা গুলি নিতে বলুন, তার পর তাকে ডান হাতে উহার দ্বিগুণ সংখ্যক গুলি নিতে অনুরোধ করুন, এর পর বাঁ হাত থেকে ৩টি গুলি ডান হাতে নিতে বলুন। এখন বাঁ হাতে যত গুলি আছে তার দ্বিগুণ সংখ্যক গুলি ডান থেকে বাঁ হাতে নিতে বলুন। এর পর আপনি বলে দিন যে, ডান হাতে নিশ্চয়ই খ × (ক + ১) বা ৩ × ২(+ ১) অর্থাৎ ৯টি গুলি বাকী আছে। বন্ধু আপনার দিব্যদৃষ্টির ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। উদাহরণ ঃ

| বাঁ হাত | ডান হাত |
|---|---|
| ১৫ | ৩০ |
| ১৫ − ৩ = ১২ | ৩০ + ৩ = ৩৩ |
| ১২ + ২৪ | ৩৩ − ২৪ |
| ৩৬ | ৯ |

উপরে যে অঙ্কগুলি দেওয়া হলো উহাদের শেষফল সব সময় একরকম হয়; কাজেই কোনো দর্শককে একইভাবে একই খেলা দ্বিতীয়বার দেখানো চলে না।

৪. অনেকেই বোধহয় জানেন না যে, 'এলিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড'-এর অমর লেখক লুইস ক্যারল ( রেভারেণ্ড চার্লস ডজসন ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। একদিন কোনো এক সান্ধ্যমজলিসে তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক মজার অঙ্কের খেলা দেখান। আগেই তিনি অঙ্কের উত্তর একটি কাগজে গোপনে লিখে গৃহকর্ত্রীর হস্তে অর্পণ করেন। আর একটি কাগজে তিনি ১০৬৬ লিখে উহার নীচে একটি ছোট মেয়েকে চার সংখ্যার যে-কোনো রাশি লিখতে বললেন। তারপর পুনরায় তিনি মেয়েটির লেখা রাশির নীচে চারটি সংখ্যা স্থাপন করলেন এবং উহার পর একটি ছোট ছেলে আরও চারটি সংখ্যা লিখল। লুইস ক্যারল আবার পঞ্চম সারিতে চারটি সংখ্যা বসালেন। অবশেষে ছেলেটিকে সব সারির সংখ্যাগুলি একত্রে যোগ দিতে বলা হলো। দেখা গেল উত্তর ২১০৬৪ হয়েছে, তখন গৃহকর্ত্রী লুইস ক্যারলের দেওয়া আগেকার কাগজখানি সকলের সামনে বের করে দেখালেন, তাতেও ঠিক ২১০৬৪ লেখা ছিল। এর গুপ্ত কৌশল এই—ছেলেমেয়েরা যে সংখ্যাই লিখুক না কেন, লুইস ক্যারল তার নীচে এমন এক সংখ্যা স্থাপন করতেন, যাতে উভয় সংখ্যার যোগফল ৯ হয়। সুতরাং যে-কোনো সংখ্যাই লেখা হোক না কেন, পাঁচ সারির যোগফল পূর্ব থেকেই তাঁর এইভাবে জানা থাকত ২ × ৯৯৯৯ + প্রথমে লেখা ১০৬৬ = ২১০৬৪

| | |
|---|---|
| লুইস ক্যারল | ১০৬৬ |
| মেয়ে | ৩৪৭৮ |
| লুইস ক্যারল | ৬৫২১ |
| ছেলে | ৭১৫০ |
| লুইস ক্যারল | ২৮৪৯ |
| যোগফল | ২১০৬৪ |

৫. আপনার বন্ধুকে বলুন শূন্যবিহীন তিন সংখ্যার একটি রাশি লিখতে। মনে করুন, তিনি লিখলেন ৮৪৭। এবার

তাকে বলুন ঐ তিনটি সংখ্যা যোগ দিয়ে ( ৮+৪+৭=১৯ ) প্রথমকার রাশি থেকে বাদ দিতে। যেমন, ৮৪৭ − ১৯ = ৮২৮। তার পর তাকে তিনটির মধ্যে যে-কোনো সংখ্যা কেটে দিয়ে বাকী দুটি সংখ্যা আপনাকে উল্লেখ করতে বলুন। যে সংখ্যাটি কাটা হয়েছে, আপনি অক্লেশে তা বলে দিতে পারবেন, যদিও আপনি আদি সংখ্যা বা কষা অঙ্ক কোনোটাই জানেন না। আপনাকে কি করতে হবে শুনুন। এমন একটি ন্যূনতম সংখ্যা চিন্তা করে বের করুন, যা বন্ধুর বলা সংখ্যা দুটির সঙ্গে যোগ দিলে যোগফল ৯ দ্বারা বিভাজ্য হয়। মনে করুন, ৮২৮ থেকে বন্ধু প্রথমে ৮ কেটে দিয়ে আপনাকে অবশিষ্ট দুটি সংখ্যা ২ ও ৮ বলেছেন। আপনি এই দুই সংখ্যা যোগ দিয়ে ( ২+৮ ) = ১০ পেলেন। দশের কাছাকাছি ১৮ একমাত্র রাশি যাহা ৯ দ্বারা বিভাজ্য। সুতরাং দশে ৮ যোগ দিতে হবে; অতএব ৮ হলো কর্তিত সংখ্যা। কখনও কখনও এমনও হতে পারে, সংখ্যাদ্বয়ের যোগফল ৯, যেমন ৪ ও ৫; সেক্ষেত্রে কর্তিত সংখ্যা হয় ০ কিংবা ৯।

৬. কাকেও বলুন ১০-এর মধ্যে যে-কোনো দুটি সংখ্যা নির্বাচন করতে। তারপর তাকে তার মধ্যে থেকে একটি সংখ্যা নিয়ে ৫ দিয়ে গুণ করে ৭ যোগ দেবার পর দ্বিগুণ করতে অনুরোধ করুন। শেষে গুণফলের সঙ্গে অন্য সংখ্যা যোগ দিয়ে উত্তর বলতে বলুন। এই উত্তর থেকে আপনি ১৪ বিয়োগ করুন, তাহলে দুই সংখ্যা-বিশিষ্ট এমন এক রাশি পাবেন, যাতে দর্শকের নির্বাচিত দুটি সংখ্যাই আছে। মনে করুন, দর্শক ৩ ও ৪ এই দুই সংখ্যা পছন্দ করলেন; তা হলে ( ৩ × ৫ + ৭ ) × ২ + ৪ − ১৪ = ৩৪

৭. এই ম্যাজিকটি খুব মজার। সাতাশখানি তাস নিয়ে এই খেলা দেখাতে হয়। দর্শককে সাতাশখানি তাসের মধ্যে থেকে একখানি তাস চিনে রাখতে বলবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন, কতগুলি তাসের পর তিনি নিজের তাসখানি দেখতে

চান। মনে করুন, ১৮শ তাসখানি নিজে দেখতে ইচ্ছা করেন। এখন নীচের তালিকা দেখলে ১৮র পাশে ৩১২ এই সংখ্যা তিনটি পাওয়া যাবে। ৩ অর্থে নীচে, ১ অর্থে উপর এবং ২ অর্থে মাঝ-খান বুঝতে হবে। এখন ঐ সাতাশখানি তাস একটির পর একটি নিয়ে সমানভাবে তিনটি স্তূপে বিভক্ত করতে হবে। তার পর দর্শককে জিজ্ঞাসা করতে হবে, কোন্ ভাগে তার তাসখানি আছে। তিনি যে ভাগ দেখিয়ে দেবেন, সেই ভাগটি পূর্বোক্ত সাংকেতিক সংখ্যাত্রয়ের অর্থানুযায়ী সর্বনিম্নে স্থাপন করে উহার উপর অন্য দুই ভাগ রাখতে হবে। পুনরায় সাতাশখানি তাস পরপর নিয়ে তিনভাগে ভাগ করে যে ভাগে তার তাস আছে, দর্শককে সেইভাগ দেখিয়ে দিতে বলবেন। এইবার নির্দিষ্ট ভাগটি নিয়ে মাঝখানে রাখতে হবে এবং উহার উপরে ও নীচে যথাক্রমে অন্য দুইভাগ স্থাপন করতে হবে। এখন গুণে দেখলে দর্শক যথার্থই ১৮শ তাসখানি নিজের দেখবেন। খেলা দেখাবার আগে এই সংখ্যা-তালিকা কণ্ঠস্থ করে নিলে ভাল হয়।

| | | |
|---|---|---|
| ১—১৩১ | ১০—১৩২ | ১৯—১৩৩ |
| ২—২৩১ | ১১—২৩২ | ২০—২৩৩ |
| ৩—৩৩১ | ১২—৩৩২ | ২১—৩৩৩ |
| ৪—১২১ | ১৩—১২২ | ২২—১২৩ |
| ৫—২২১ | ১৪—২২২ | ২৩—২২৩ |
| ৬—৩২১ | ১৫—৩২২ | ২৪—৩২৩ |
| ৭—১১১ | ১৬—১১২ | ২৫—১১৩ |
| ৮—২১১ | ১৭—২১২ | ২৬—২১৩ |
| ৯—৩১১ | ১৮—৩১২ | ২৭—৩১৩ |

৮. এবার নীচের দিকে ছয়টি সংখ্যা তালিকা দেওয়া হলো। প্রতি তালিকায় ৩টি করে স্তম্ভ আছে। দর্শককে বলুন যে, এর মধ্য থেকে যে-কোনো এক সংখ্যা নির্বাচন করে নিতে এবং কোন্ কোন্

তালিকায় তার সংখ্যা আছে, তা নির্দেশ করে দিতে। আপনি শুধু দর্শককে দেখানো সমস্ত তালিকার ভিতর প্রথম স্তম্ভের প্রথম সংখ্যাগুলি যোগ দেবেন; তাহলে নির্বাচিত সংখ্যাটি পেয়ে যাবেন। মনে করুন, তিনি মনে মনে ২৪ ভাবলেন আর 'ক' ও 'খ' তালিকা দেখিয়ে দিলেন। এই দুই তালিকার প্রথম স্তম্ভের প্রথম সংখ্যা ৮ ও ১৬ একত্রে যোগ দিলে ২৪ হয়, সুতরাং তিনি নিশ্চয় ২৪ ভেবেছেন।

| ক | | | খ | | | গ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | ২৭ | ৪৬ | ১৬ | ২৭ | ৫৪ | ১ | ২৩ | ৪৫ |
| ৯ | ২৮ | ৪৭ | ১৭ | ২৮ | ৫৫ | ৩ | ২৫ | ৪৭ |
| ১০ | ১৯ | ৫৬ | ১৮ | ২৯ | ৫৬ | ৫ | ২৭ | ৪৯ |
| ১১ | ৩০ | ৫৭ | ১৯ | ৩০ | ৫৭ | ৭ | ২৯ | ৫১ |
| ১২ | ৩১ | ৫৮ | ২০ | ৩১ | ৫৮ | ৯ | ৩১ | ৫৩ |
| ১৩ | ৪০ | ৫৯ | ২১ | ৪৮ | ৫৯ | ১১ | ৩৩ | ৫৫ |
| ১৪ | ৪১ | ৬০ | ২২ | ৪৯ | ৬০ | ১৩ | ৩৫ | ৫৭ |
| ১৫ | ৪২ | ৬১ | ২৩ | ৫০ | ৬১ | ১৫ | ৩৭ | ৫৯ |
| ২৪ | ৪৩ | ৬২ | ২৪ | ৫১ | ৬২ | ১৭ | ৩৯ | ৬১ |
| ২৫ | ৪৪ | ৬৩ | ২৫ | ৫২ | ৬৩ | ১৯ | ৪১ | ৬৩ |
| ২৬ | ৪৫ | | ২৬ | ৫৩ | | ২১ | ৪৩ | |

| ঘ | | | ঙ | | | চ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | ৪৩ | ৫৪ | ৪ | ২৩ | ৪৬ | ২ | ২৩ | ৪৬ |
| ৩৩ | ৪৪ | ৫৫ | ৫ | ২৮ | ৪৭ | ৩ | ২৬ | ৪৭ |
| ৩৪ | ৪৫ | ৫৬ | ৬ | ২৯ | ৫২ | ৬ | ২৭ | ৫০ |
| ৩৫ | ৪৬ | ৫৭ | ৭ | ৩০ | ৫৩ | ৭ | ৩০ | ৫১ |
| ৩৬ | ৪৭ | ৫৮ | ১২ | ৩১ | ৫৪ | ১০ | ৩১ | ৫৪ |
| ৩৭ | ৪৮ | ৫৯ | ১৩ | ৩৬ | ৫৫ | ১১ | ৩৪ | ৫৫ |
| ৩৮ | ৪৯ | ৬০ | ১৪ | ৩৭ | ৬০ | ১৪ | ৩৫ | ৫৮ |

| ঘ | ঙ | চ |
|---|---|---|
| ৩৯ ৫০ ৬১ | ১৫ ৩৮ ৬১ | ১৫ ৩৮ ৫৯ |
| ৪০ ৫১ ৬২ | ২০ ৩৯ ৬২ | ১৮ ৩৯ ৬২ |
| ৪১ ৫২ ৬৩ | ২১ ৪৪ ৬৩ | ১৯ ৪২ ৬৩ |
| ৪২ ৫৩ | ২২ ৪৫ | ২২ ৪৩ |

৯. ৬৪ কি কখনও ৬৫-র সমান হয়? বোধহয় কখনও কখনও হয়। প্রথমে শক্ত কাগজে বা কার্ডবোর্ডে চার চৌকা একটি বর্গ আঁকুন আর দাবা বোড়ের ছকের মতো ওকে ৬৪ ভাগে ভাগ করুন।
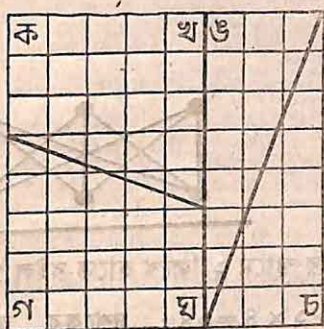
১ম ৬৪ = ২য় ৬৫
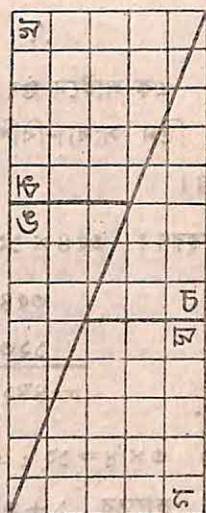
এবার কাঁচি দিয়ে ওই বর্গক্ষেত্র নীচেকার ছবির মতো চার ভাগে বিভক্ত করুন। তার পর দ্বিতীয় ছবির মতো ওই টুকরাগুলি নতুন করে সাজান, তাহা হলে গুণে দেখবেন সত্যিই ৬৪ = ৬৫।

১০. ১ = ২ বিশ্বাস হয় না। পরশুরাম-বর্ণিত প্রফেসার মহেশ মিত্তির যেমন অঙ্ক করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, ঈশ্বর = ০, আত্মা

=ভূত= ৵০ ; তেমনি আমরা বীজগণিতের সাহায্যে প্রতিপন্ন করছি যে, ১=২ হয়।

$$\text{মনে করুন, } a=b$$

$$\text{তাহলে } ab=a^2$$

$$\therefore \quad ab-b^2=a^2-b^2$$

$$\therefore \quad b(a-b)=(a+b)(a-b)$$

$$\therefore \quad b=a+b$$

$$\therefore \quad b=2b$$

$$\therefore \quad 1=2$$

১১. এক লাইনে গুণ। এই নিয়মে তিন সংখ্যা-বিশিষ্ট কোনো রাশিকে তিন সংখ্যা-বিশিষ্ট অপর এক রাশি দিয়ে মনে মনে গুণ করা যায়।

উদাহরণ : ৩৫৪ × ১২৩
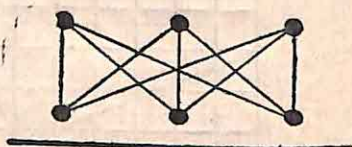
(ক) ৩ × ৪ = ১২ ; এককের স্থানে ২ লিখে হাতে রইল ১।

(খ) হাতের ১ + ৩ × ৫ + ২ × ৪ = ২৪ ; দশকের স্থানে ৪ লিখে হাতে থাকল ২।

(গ) হাতের ২ + ৩ × ৬ + ১ × ৪ + ২ × ৫ = ৩৪ শতকের স্থানে ৪ লিখে হাতে থাকল ৩।

(ঘ) হাতের ৩ + ২ × ৬ + ১ × ৫ = ২০ ; সহস্রের স্থানে ০ লিখে হাতে রইল ২।

(ঙ) হাতের ২ + ১ × ৬ = ৮ ; অযুতের স্থানে ৮ লিখলেই গুণ সম্পূর্ণ হবে।

সবশেষে এই পুস্তকের পাঠক-পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি, নবম ও দশম সংখ্যক অঙ্কে আমরা যে অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করলাম তার ত্রুটি কোথায় ?

## গ্রন্থপঞ্জী


1. *Mathematical Recreation* : Rouse Ball
2. *Figures for Fun* : Perelman.
3. Ripley's *Believe or Not.*


---

## বয়স গণনা

যদি কারও বয়স গণনা করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথমে সেই লোককে যে মাসে তার জন্ম সেই মাসের সংখ্যা লিখতে বলুন ; অর্থাৎ বৈশাখ মাসে তার জন্ম হলে সে ১ লিখবে, জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম হলে ২ লিখবে, আশ্বিন মাসে হলে ৬ লিখবে। তারপর ঐ সংখ্যাকে দ্বিগুণ করতে বলুন। তারপর তাতে ৫ যোগ করতে ও যোগফলকে ৫০ দিয়ে গুণ করতে বলুন। গুণফলে তার গত শেষবারের জন্মদিনে পূর্ণ বয়স যোগ করতে ও যোগফল থেকে ৩৬৫ বিয়োগ করতে বলুন। বিয়োগফলে ১১৫ যোগ করে তাকে উত্তর বলতে বলুন। যদি দুটি সংখ্যা উত্তর হয় তাহলে প্রথমটি জন্মমাসের সংখ্যা ও শেষ দুইটি গত জন্মদিনে পূর্ণ বয়সের সংখ্যা। যদি তিনটি সংখ্যা উত্তর হয় তাহলে প্রথমটি জন্মমাসের সংখ্যা ও শেষ দুইটি গত জন্মদিনে পূর্ণ বয়সের সংখ্যা। যদি চারটি সংখ্যা উত্তর হয় তাহলে প্রথম দুইটি জন্মমাসের সংখ্যা ও শেষ দুটি গত জন্মদিনে পূর্ণ বয়সের সংখ্যা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কারও ৬১৬ উত্তর হয়, তাহলে আশ্বিন তার জন্মমাস এবং গত শেষবারের জন্মদিনে তার ১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে ; অর্থাৎ আগামী জন্মদিনে তার ১৭ বৎসর পূর্ণ হবে।

## রহস্যজনক-৩৭

কোনো দর্শককে অনুরোধ কর, পাশাপাশি তিনটি একই রকম অঙ্ক ( digit ) লিখতে, তারপর তাকে ঐ অঙ্ক তিনটির যোগফল দিয়ে ঐ তিন অঙ্কের নির্বাচিত সংখ্যাকে ভাগ করতে বল। এবার তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করেই বলে দাও, উত্তর ৩৭ হয়েছে। আসলে সে একই রকম তিন অঙ্কের যে সংখ্যাই লিখুক না কেন উত্তর সর্বদা ৩৭ হবেই। যেমন, ৩৩৩-কে ( ৩+৩+৩ ) ৯ দিয়ে ভাগ করলে ৩৭ হয়।

এই খেলাটি অন্যভাবেও শেষ করা যায়। খেলা দেখাবার অনেক আগেই তুমি লুকিয়ে সাবানের কুচি দিয়ে নিজের হাতের ওপর ৩৭ লিখে রাখবে, শুকিয়ে গেলেই এই লেখার আর কোনো চিহ্নই থাকবে না। তারপর অঙ্ক কষা হয়ে যাবার পর দর্শককে বলবে ঐ কাগজখানি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে। তুমি করবে কি ঐ অঙ্ক কষা কাগজের ছাই নিয়ে কেবল হাতের ওপর ঠিক ঐ জায়গায় আস্তে আস্তে ঘষে দেবে, এর ফলে ছাই লেগে ঐখানে ৩৭ সংখ্যাটি আশ্চর্যরকমভাবে ফুটে উঠবে। অথবা আগে থাকতেই দুধ দিয়ে কোনো কাগজের গায়ে ৩৭ লিখে শুকিয়ে নেবে। অঙ্ক কষার পর দর্শককে বলবে ঐ কাগজখানি নিয়ে অগ্নির উত্তাপে গরম করতে, তাহলেই ৩৭ সংখ্যাটি বাদামীবর্ণের হয়ে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে। কিংবা শীতকালে কোনো আর্শির গায়ে আগে থেকেই আঙ্গুলের চাপ দিয়ে ৩৭ সংখ্যাটি লিখে রাখবে, তারপর অঙ্ক কষা হয়ে গেলে দর্শককে বলবে সেই আর্শির কাছে গিয়ে হাঁ করে মুখের ভাপ দিতে, তাহলে সে তার কষা অঙ্কের উত্তর আর্শির গায়ে সুস্পষ্টভাবে উদয় হতে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাবে।

## তাসের পৌনঃপুনিকতা

### অঙ্কের চক্র

এবার এখানে যাদুবিদ্যার একটা গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করছি। ৫২খানি তাস নিয়ে যদি টেক্কা থেকে সাহেব পর্যন্ত পরপর রঙ হিসাবে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে সাধারণভাবে যতবারই ঐ প্যাকেট কাটানো যাক না কেন, তাসের ঐ ক্রমিক সজ্জা কখনও বিনষ্ট হয় না। অবশ্য ওপরের তাসকে ঠিক তলার তাসের পর বলে ভাবতে হবে।

এ ছাড়া, যদি সাজানো সমস্ত তাস দুভাগ করে সুকৌশলে সুন্দর-ভাবে শাফ্‌ল করে ১২ বার মেশানো হয়, তাহলেও নির্দিষ্ট সময়ের পর

তাসের আগেকার সেই ধারাবাহিকতা ফিরে আসতে পারে। এখানে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রথমে প্রত্যেক রঙের টেক্কা থেকে আটা পর্যন্ত সমস্ত তাস পরপর সাজিয়ে নিতে হবে, তাহলে সবশুদ্ধ হাতে ৩২খানি সাজানো তাস হল। এরপর তাসের গোছাকে গুণে ঠিক দুভাগ করবে, যাতে প্রত্যেক ভাগে ১৬খানি করে তাস থাকে। দর্শককে বলবে এক ভাগ নিতে, আর তুমি রাখবে অন্যভাগ। দুজনেই কিন্তু সব তাস উল্টো করে ধরবে। তারপর পেটাপেটি খেলার মতো তুমি একখানি তাস উল্টে রাখবে আর তার উপর রাখবে দর্শক একখানি তাস। এইভাবে অগ্রসর হতে হবে, যতক্ষণ না দুজনের হাতের তাস নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর নতুন তাসের স্তূপ নিয়ে আবার ঠিক অর্ধেক করে দুপক্ষই আগেকার মতো পেটাপেটি খেলবে। এইভাবে ৬ বার খেলবার পর তাসের প্যাকেটটি হাতে নিয়ে তুমি একটির পর একটি তাস তুলে দর্শককে দেখাবে যে, প্রত্যেক রঙের ঠিক এক থেকে আট পর্যন্ত সব তাস আশ্চর্যরকমভাবে ক্রমান্বয়ে উঠে আসছে, যদিও ইতিপূর্বে দুজনে মিলে ৬ বার ভালভাবে পেটাপেটি করে সমস্ত তাস মেশানো হয়েছে।

এইরকমভাবে যদি ৫২খানি তাস টেক্কা থেকে সাহেব পর্যন্ত রঙ হিসাবে সাজিয়ে নিয়ে খেলা দেখাতে হয়, তাহলে ১২ বার পেটাপেটি করতে হবে। সব সময়ই সাজাবার পর তাসের উল্টো পিঠ ওপরে করে খেলা দেখানো উচিত, তবেই দর্শকরা আরও বেশি অবাক হয়ে যাবে। এই খেলার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে নির্ভুলভাবে নির্দিষ্ট বার পেটাপেটি করে তাস মেশানোর ওপর। প্রত্যেক বার তাসের গোছা ঠিক দুই ভাগ করতে হবে যাতে প্রত্যেক অংশে ২৬খানি করে তাস থাকে।

## তাসের ফোঁটার সংখ্যা নির্ণয়

তোমার বন্ধুকে বলবে টেবিলের ওপর একখানি তাস রেখে তাতে কত ফোঁটা আছে গুণে দেখতে। তারপর তাকে তার ওপর আবার কয়েকখানি তাস রাখতে বলবে যাতে করে ফোঁটা আর তাসের সংখ্যা দুই মিলিয়ে সবশুদ্ধ ১২ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রথমে রাখা তাস আটা হয়, তাহলে তার ওপর আরও চারখানা তাস স্থাপন করতে হবে। এইভাবে অগ্রসর হয়ে যতগুলি সম্ভব স্তূপ গঠন করে নিতে হবে।

তুমি বা তোমার বন্ধু কেউই জানে না নীচেকার সব তাসের ফোঁটার যোগফল কত হয়েছে। শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে ক'খানি তাস অবশিষ্ট আছে, আর কতগুলি তাসের স্তূপ তৈরি হয়েছে। তাহলে তলাকার সব তাসের ফোঁটার সংখ্যা হবে ১৩ × ( তাসের স্তূপের সংখ্যা − ৪ ) + বাকী তাস। যদি আটটি স্তূপ হয় ও একখানি তাস বাকী থাকে তাহলে ফোঁটার সংখ্যা ১৩ × (৮ − ৪) + ১ = ৫৩

---
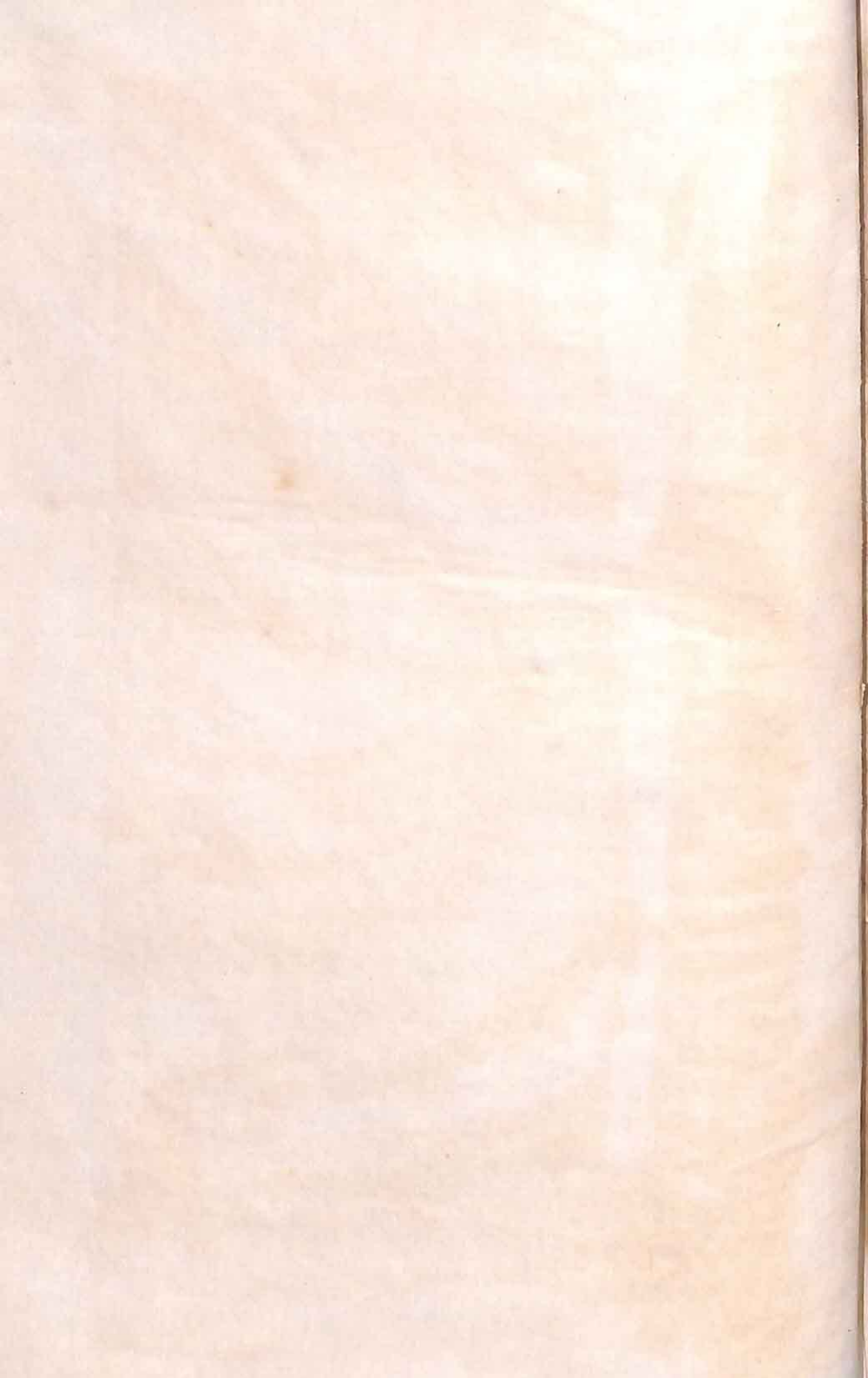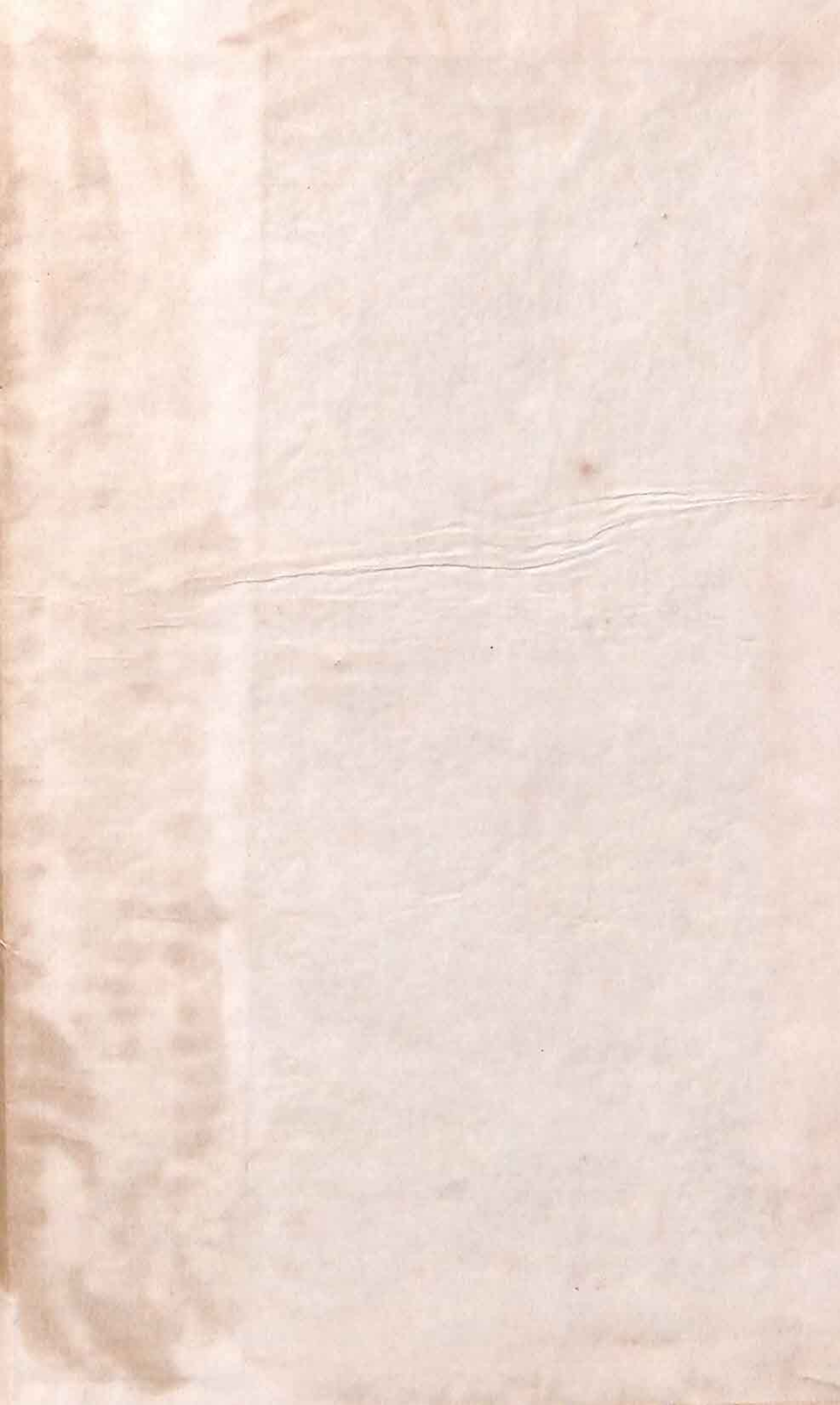
## বিদেশের সব সেরা বইগুলির
### সহজ-সরস অনুবাদ

[ ছোটদের জন্য ]

| | |
|---|---|
| ডেভিড কপারফিল্ড | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় |
| অলিভার টুইস্ট | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় |
| গালিভার্স ট্র্যাভেল্স্ | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় |
| রবিন হুড | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় |
| দি সুইস্ ফ্যামিলি রবিনসন | দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় |
| টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্স আণ্ডার দি সী | অজিতকুমার সরকার |
| ওয়ার অ্যাণ্ড পীস | অশোক গুহ |
| ছোট রাজকুমার | ফাদার ডভিয়ের |
| পিকউইক পেপার্স্ | অশোক গুহ |
| রবিনসন ক্রুশো | অশোক গুহ |
| অ্যাডভেঞ্চার অব লে ভেরী | বিশু মুখোপাধ্যায় |
| নীল সাগরের নীচে [ওয়াটার বেবিজ] | 'চন্দ্রহাস' |
| টম্ ব্রাউন্স্ স্কুল ডেজ | অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী |
| দি চিলড্রেন অফ্ দি নিউ ফরেস্ট | অনিলেন্দু চক্রবর্ত্তী |
| হ্যান্স্ অ্যাণ্ডারসেনের গল্প | খগেন্দ্রনাথ মিত্র |
| জার্নি টু দি সেণ্টার অফ্ দি আর্থ | কুঞ্জবিহারী পাল |
| অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ | প্রদ্যোৎ গুহ |
| হোয়াট কেটি ডিড্ অ্যাট স্কুল | প্রদ্যোৎ গুহ |

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং